Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বিলকিস আক্তার

রোলঃ 23090120896

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বিলকিস আক্তার

রোলঃ 23090120896

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস? " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে বিলকিস আক্তার, আইডিঃ 23090120896 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

বিলকিস আক্তার

আইডিঃ 23090120896

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 7

একজন নারীবাদের চিন্তাধারা 9

নারীবাদী কূটকৌশল 11

নারীবাদের উপেক্ষিত ইতিহাস 15

লিবারেলিজম কেনো চায় না আপনি নিকাব পরিধান করুন? 19

নারী নেতৃত্ব 23

পুরুষতন্ত্র:নারীদের চাহিদা 25

নারীবাদের প্রতিক্রিয়া 29

নারীবাদ নাকি সেক্সিষ্ট 35

পুরুষদের প্রতি জাতিগত ঘৃণা কি অবিচারের সমাধান? 40

নির্যাতিতরা দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত নয় 41

নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর 43

পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে তিনটি মিথ 51

পারিবারিক সহিংসতার মিথ্যাচার 57

মুসলিম নারীবাদ: উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন 63

মাতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ: মুসলিম নারীবাদীদের অবস্থান 66

নারীবাদ-নারীমুক্তি নাকি নারীত্ব তথা মানবতার ধ্বংস? 70

নারীবাদী আন্দোলন 74

হারমেনিউটিক্স ও ইসলামের নারীবাদী ব্যাখ্যা 76

হারমেনিউটিক্সের ইতিহাস ও বিবর্তন 78

ইসলামি নারীবাদের ভ্রান্তি 82

লিঙ্গরুপান্তরবাদ ও আমাদের স্বর্গীয় প্রকৃতির লঙ্ঘন 86

লিঙ্গ ভারসাম্য: আল্লাহর পরিকল্পনার প্রতি আত্মসমর্পণ 90

স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি আত্মসমর্পণ 91

নারী,সংস্কৃতি ও ইসলাম 97

নারীত্ব ও শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক প্রভাব 100

নারীত্ব, নারীবাদ নয় 102

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামি শরিয়াহ ও নারী অধিকার 106

র‍্যান্ডের অপবাদের জবাব 106

ইসলামি শরিয়াহ ও নারী অধিকারের ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের অবস্থান ও মুসলিমদের দায়িত্ব 109

জব সেক্টরে নারী 112

মুসলিম নারীদের পশ্চিমাদের কাতারে নেওয়ার জন্য আকর্ষণ করা 115

হিজাবের প্রতি র‍্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা ও মুসলিমদের দায়িত্ব 118

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি 120

বাচাও জীবনগুলো,বাচাও চেতনা 125

নারীত্বের প্রয়োগ 129

বিয়ে 132

নারীত্ব থেকে স্ত্রীত্ব 135

রেফারেন্স 138

ভূমিকা

'তথ্য না থাকলে আপনি আর দশজনের মতোই একজন মতামতসর্বস্ব মানুষ মাত্র।'----- উইলিয়াম এডওয়ার্ড ডেমিং

এটা সত্য যে, নারীবাদের সমালোচনা বহু লোকই করে থাকেন। কিন্তু যে মাত্রায় তা হওয়া উচিত, এ প্রসঙ্গে সে মাত্রার বইয়ের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। আমার জানামতে নারীবাদ পরিবার, সম্প্রদায়; বিশেষত পশ্চিমা সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করছে, সে অনুপাতে একে কখনোই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়নি। কীভাবে এটি পুরুষের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন এবং নারীদের অধঃপতিত করছে, সেই নির্মম বাস্তবতা আর কোনো বইয়ে এতটা নিখুঁতভাবে উঠে আসেনি।

উপনিবেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত প্রত্যেক ব্যক্তিই এ বিষয়টি স্বীকার করবে যে, ইসলামি বিশ্বে পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে ইউরোপের অন্যতম টার্গেট ছিল মুসলিম নারীসমাজ। মুসলিম-সমাজে তাদের কর্তৃত্ব ও আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী-সংক্রান্ত বিষয়াবলিকে তারা প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

বর্তমানেও আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে নারী সংশ্লিষ্ট অসার কিছু স্লোগানকে।

নারী-স্বাধীনতা, নারী-অধিকার, জেনডার ইকুয়ালিটি (লিঙ্গসমতা)-এর মতো মুখরোচক স্লোগানগুলো মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ পলিসিতে পশ্চিমাদের হস্তক্ষেপের অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে।

আধুনিক মিডিয়া ও যোগাযোগ-মাধ্যম ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার কল্যাণে এই আগ্রাসনের মাত্রা ও ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পশ্চিমায়ন, জাতিসংঘের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায়নের ফলে মুসলিমদের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন একটি শৈল্পিক ও বৈধ রূপ ধারণ করেছে।

জাতিসংঘ ও আমেরিকার পলিসি মেকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো 'র‍্যান্ড কর্পোরেশন'। এই র‍্যান্ড কর্পোরেশন পশ্চিমা রাজনৈতিক পলিসিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের অধীনে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৫ সালে। এরপর ১৯৪৮ সালে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারিভাবে নিবন্ধিত হয়।

তবে যেই নারীর জন্য মাতৃত্ব, স্ত্রীত্ব বলতে কিছু নেই। বরং সে প্রকাণ্ড পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক যন্ত্রের একটা নগণ্য দাঁতমাত্র। তার কাছে নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, নিজের ক্যারিয়ার, চাকরি-বাকরি সর্বাগ্রে। অন্যসব কিছু আসে তার পরে। তার অধীন হয়ে। যেই নারী নিজেকে মেলে ধরতে চায়। সে নিরন্তর বিদ্রোহ করে সমাজের বিরুদ্ধে, সমাজের নীতি-নৈতিকতার বিরুদ্ধে।

এই সমাজ তার কাছে পুরুষশাসিত, পিতৃতান্ত্রিক। যার গোড়াপত্তন-ই হয়েছে নারীদেরকে দাসী, অধীনস্থ বানিয়ে রাখার জন্যে। এবার বিদ্রোহ করে সেই সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে নারীকে নিজের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ, নীতি-নৈতিকতা, আইন সবকিছুকেই নতুনভাবে দেখতে হবে, সাজাতে হবে, বিন্যস্ত করতে হবে। তাহলেই মিলবে নারীজাতের মুক্তি। পরম মোক্ষ।

________★★★________

একজন নারীবাদের চিন্তাধারা

উচ্চমাধ্যমিকে পড়াকালীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর সময়টায় নিজেকে তারা একজন নারীবাদী বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

সামগ্রিকভাবে বিয়ে এবং সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ থাকে না। তখন তারা থাকে শুধুমাত্র একজন নারীবাদী। বিয়ে মানে তাদের নিকট ছিল দুর্বলতা ও বন্দিশালা। যা তাদের স্বাধীনতা ও সক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করবে। তাদের মনে হয়, নিজের দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করার জন্য কেন তাদেরকে একজন পুরুষের শরণাপন্ন হতে হবে? এই প্রশ্নটি তাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে এবং তাড়া করে বেড়ায়। তাদের যদি কেউ বিয়ে-সংক্রান্ত প্রশ্ন করে, তাহলে তারা তাদেরকে এককথায় 'না' বলে দেয়।

তাদের ধারণা থাকে সন্তান মানেই সে মাকে ক্লান্ত করে তুলবে। প্রতিদিন একই ক্রমান্বয় অনুসরণ করে একজন মায়ের জীবনযাপন চলবে। তারচেয়ে ভয়াবহ হলো, এই ক্লান্তি ও অবসাদ কখনোই সমাপ্ত হবে না; বরং একের পর এক জীবনভর তা চলতেই থাকবে।

তাদেরর কাছে মনে হয়, মাতৃত্ব মানে একজন মানুষকে নির্বাসিত করে দেওয়া। তার জীবনের সব সুখ ও শখ কেড়ে নেওয়া। তাই বুঝেশুনে আমি আমার ভবিষ্যৎকে সেদিকে ঠেলে দিতে চাইবো না।

কারণ তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য তাদের কাছে সবচেয়ে বড়। বরং এগুলোই তাদের অস্তিত্ব। তারা কখনোই তা বিসর্জন দিতে চায় না। তাই বিয়ের প্রশ্ন এলেই তাদের একটিই উত্তর ছিল-'না'।তাদের চিন্তায় এইগুলোও থাকে যে,

বিয়ে করিনি। কোনো বাচ্চা নেই। আমি স্বাধীন। আমি সুখী। আমি আমার মতো। আমি শুধু আমার। আর কারও নই।

কিন্তু........

এগুলো এমন শরাব, যা আমাদের নারীদের পান করানো হচ্ছে আর তারা তৃপ্তিভরে তা পান করছে। আমরা স্বার্থপর একটি পৃথিবীতে বড় হচ্ছি; এখানে 'আমি' ছাড়া আর কোনো আওয়াজ শোনা যায় না। আর কোনো শব্দ কানে বাজে না।

একজন মানুষের লিবারেল হয়ে বেড়ে ওঠার সকল উপকরণ আমাদের চারপাশে রয়েছে। সরকারি সংস্থা, হলিউড ইত্যাদির মগজ ধোলাই, মিউজিক, ম্যাগাজিন, বই, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় লিবারেলিজমের ছাঁচেই গড়া। এসব উপকরণ আমাদের মস্তিষ্ককে পরিপূর্ণ করে ফেলে। আমরা হয়ে উঠি জড় সভ্যতা, পুঁজিবাদ, ভোগবাদ ও স্বার্থপরতার মূর্খ সৈনিক। সবশেষে একটি মেয়ে নারীবাদী হয়। এসব মতবাদ ও মতাদর্শ একজন নারীকে এমন প্রতিটি ব্যক্তি ও

বস্তুকে তুচ্ছ করতে শেখায়, যা তার কথিত স্বাধীনতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামী ও সন্তান এই তালিকার শীর্ষে অবস্থান করে।
তাদের দৃষ্টিতে স্বামী ও সন্তান কথিত স্বাধীনতার পথে অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা।

আজকের তরুণীদের শেখানো হচ্ছে, বিয়ের কথা ভুলে যাও। সবসময় পুরুষের কী প্রয়োজন? মাতৃত্বকে ভুলে যাও। সন্তান নেওয়ার ধারণাকে পরিত্যাগ করো। কেন শুধু শুধু মাথায় বোঝা নিতে চাও? তোমাকে এখন যা করতে হবে তা হলো-নিজের পড়াশোনা ও চাকুরিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাও। নিজের পথ নিজে তৈরি করো। নিজের টার্গেটকে বড় করো। সেখানে পৌঁছার জন্য পরিশ্রম করো। ডিগ্রি নাও। মাস্টার্স, পিএইচডি ও গবেষণা করো। থিসিস প্রকাশ করো। বড় বড় কোম্পানিতে চাকুরির সম্ভাবনা তৈরি করো। বড় পদ ও পদবি অর্জন না করে থামবে না; নিজের স্বাতন্ত্র্যকে ধরে রাখো। দেখবে জীবন কত সুন্দর। এটা তখনই হবে যখন তুমি একজন স্বয়ংসম্পন্ন স্বাবলম্বী নারী হতে পারবে।

অথচ বাস্তবতা হলো, এসবের পেছনে ছুটতে গিয়ে আমরা এখন যেন পাহাড় থেকে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছি।

তাদের এসব কল্পনাবিলাস ও কথার চাকচিক্যে আমরা আমাদের জীবনকে নষ্ট করেছি। বহু বছর আমরা এসব কল্পনা ও অনর্থক স্বপ্নের পেছনে ছুটেছি।

_______★★★_______

নারীবাদী কূটকৌশল

নারীবাদের মিথ্যাচার এবং ভন্ডামি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় নাহয় খানিক বাদেই গেলাম; তার আগে আসুন দেখে নেওয়া যাক-যেকোনো মতাদর্শ বিস্তারে প্রোপাগান্ডা কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে; চাই তা হোক নারীবাদ, শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ কিংবা অন্য কোনো আন্দোলন। প্রোপাগান্ডা কী? এই প্রশ্নে আমি মেরিয়াম ওয়েবস্টার প্রণীত সংজ্ঞাটিই উল্লেখ করতে চাই। অভিধানটি বলছে-

'প্রোপাগান্ডা হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপকার, ক্ষতি কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোনো ধারণা, তথ্য বা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া অথবা এ জাতীয় প্রভাব ফেলতে সক্ষম যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা।'

অক্সফোর্ড অনলাইন অভিধানে প্রোপাগান্ডার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে-

-

'কোনো তথ্য, বিশেষত পক্ষপাতদুষ্ট বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য, যা কোনো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি বা মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়।'

ইতিহাসের পুরোটা সময়জুড়ে জনসম্মুখে আলোচিত হয়েছে, এমন প্রায় প্রতিটি ইস্যুই প্রোপাগান্ডার আওতাভুক্ত।

ফেমিনিজমের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন (Gynocentrism) বলতে যে বিষয়টা আছে, তা বাদ দিয়ে নারীবাদ সম্পর্কে যেকোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মেরিয়াম ওয়েবস্টার-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী Gynocentrism হচ্ছে-

-

'নারীসুলভ আগ্রহ বা নারীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেওয়া বা এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।'

এ প্রসঙ্গে আরবান ডিকশনারি বলছে-

-

'নারীকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া, এমনকি অন্যের ক্ষতিসাধন করে হলেও। প্রায়শই যার ফলাফল হলো নারীর আধিপত্য।'

সবশেষে পুরুষবিদ্বেষের (Misandry) সংজ্ঞাটাও জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

নারীকেন্দ্রিকতার মতো এটিও ফেমিনিজমের অবিচ্ছেদ্য অংশ; বরং বলা ভালো এটি ছাড়া ফেমিনিজমের টিকে থাকাই দায়। মেরিয়াম ওয়েবস্টার-এর সহজ সংজ্ঞায় একে বলা হয়েছে- 'পুরুষদের প্রতি ঘৃণা।' এসব সংজ্ঞাপর্ব শেষে এখন আমরা ফেমিনিজমের তৈরি ঘৃণা ও বিদ্বেষের গহ্বর তালাশে পুরোদস্তুর প্রস্তুত।

প্রাথমিক অবস্থায় নারীবাদের সূচনা হয়েছিল বিবাহ ও পারিবারিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হাত ধরে। শুরুর দিকে নারীবাদীরা বিশ্বাস করত, বিয়ের পর একজন মেয়ের পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের অনেকে বিবাহকে চিহ্নিত করত দাসত্বেরই ভিন্ন একটি রূপ

হিসেবে। শুধু তা-ই নয়, নিজ মতের সমর্থনে তারা যুক্তি দেখাত-সমাজ পুরুষদের যে অধিকার দিয়েছে, তার বেশির ভাগ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে নারীরা। সাদা চোখে তাদের অভিযোগ ন্যায়সংগত বলেই মনে হয়, কিন্তু ভেতরের কথা মুদ্রার অপর পিঠের মতোই সম্পূর্ণ বিপরীত।

যুদ্ধের সময় নারীদের জন্মভূমি রক্ষা করার প্রয়োজন হয়নি। একটা সময় পর্যন্ত তাদের অর্থনৈতিক দায়ভার পুরোটাই বহন করত স্বামীরা। সন্তান জন্মদান, লালনপালন এবং পরিবারের সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ছাড়া আবহমানকাল ধরে প্রায় তেমন কিছুই করতে হয়নি নারীদের। এসবের বাইরে সবকিছু প্রধানত স্বামীকেই সামলাতে হতো। বর্তমানে নারীবাদী আদর্শে যদিও সামান্য পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু মোটাদাগে এখনও এই আন্দোলন বিয়ে ও পারিবারিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত বিরোধী। এখনও তারা দায়িত্ব-কর্তব্যমুক্ত অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির অলীক খোয়াবে বিভোর। এজন্য দেশে দেশে লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলনে রাজপথ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। ফেমিনিজমের বিভিন্ন উপদল (Subset) এবং ধাপ (wave) রয়েছে। তবে এই বইয়ে আমরা সেসবের দুটি নিয়েই কথা বলব—-

- যথোচ্ছা নারীবাদ (Choice Feminism)

অন্তর্বিভাগীয় নারীবাদ (Intersectional Feminism)

আমার আলোচনা এই দুই বিষয়ে সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো-নারীবাদের অন্যান্য সব দল-উপদলও কোনো না কোনোভাবে এই দুই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

১৯৮৯ সালে কিম্বারলি ক্রেনশ প্রথমবারের মতো ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজমের ধারণা প্রবর্তন করেন। এই ধারাটি নির্যাতন-নিপীড়নের একধরনের শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করেছে, নারীবাদকে সম্পৃক্ত করেছে নাগরিক অধিকারের সাথে। তাদের মতে-লিঙ্গ, বর্ণ, জাতিতত্ত্ব, শ্রেণি এবং সক্ষমতাভেদে নারীদের নিপীড়িত হওয়ার মাত্রায় তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

ইতোমধ্যে ফেমিনিজমের প্রধান দুটি ধারার প্রাথমিক পরিচয় খোলাসা করা গেছে, এবার তাদের প্রোপাগান্ডা ও বিতর্কের কৌশলের দিকে নজর দেওয়া যাক। নারীবাদীদের ব্যবহৃত প্রতিটি কূটকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব, কিন্তু এত বিশাল বিষয়ের জন্য গোটা কয়েক স্বতন্ত্র বই দরকার।অনুপ্রবেশ বা Entryism দিয়েই শুরু করা যাক। অক্সফোর্ড লিভিং ডিকশনারি অনুসারে এন্ট্রিজম বলা হয়-

- 'কোনো রাজনৈতিক দলের নীতিমালা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করার অভিপ্রায়ে ভিন্ন কোনো দলের সদস্যদের অনুপ্রবেশ।'

যাহোক, সার্কেসিয়ান রাতারাতি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। এরপর ২০১১ সালের দিকে একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায়, কলেজশিক্ষার্থীদের সামনে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং অকপটে স্বীকার করছেন-তিনি কখনোই ভিডিও গেমের অনুরাগী ছিলেন না। শুধু তা-ই নয়, কোনোরূপ রাখঢাক না রেখেই সেই বক্তৃতায় স্বীকারোক্তি দেন-নেহায়েত ফেমিনিজম ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই ভিডিও গেম শিখেছিলেন তিনি। ভিডিও গেমের জগতে জড়ানোর প্রেরণার উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

- 'আমি ভিডিও গেমের ভক্ত নই। মূলত আমাকে এটি শিখতে হয়েছিল নারীবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে।'

প্রায় প্রতিটি শিল্পে, সমস্ত পশ্চিমা সরকারে আমরা ফেমিনিস্টদের এই অনুপ্রবেশ দেখতে পাই। খেলাধুলা, শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্যসেবা-প্রত্যেকটি খাতে অনুপ্রবেশ করেছে তারা। নারীবাদী আদর্শকে সমর্থন করে-এমন রাষ্ট্রীয় নীতিমালা তৈরি ও বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ফেমিনিস্টরা বিশ্বজুড়ে গড়ে তুলেছে নিজস্ব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বৃহত্তর নেটওয়ার্ক। এ রকম দুটি সংস্থা হচ্ছে-

- League of Women Voters এবং
- National Organization of Women

এই সংগঠনগুলো কেবল নারীবাদী মতাদর্শকেই প্রচার করে না, অধিকন্তু নারীবাদী প্রার্থীদের জন্যও সরকারি অফিসগুলোতে প্রচার-প্রচারণা চালায়। একই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে তাদের পছন্দের প্রার্থীর আক্রমণে অর্থলগ্নিও করে।

পশ্চিমা বিশ্বের বেশির ভাগ নারীকেন্দ্রিক (Gynocentric) আইন এবং আইনিব্যবস্থার জন্য মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা পুরুষবিদ্বেষী এইসব নেটওয়ার্কই দায়ী। তাদের আইনি সহায়তা করতে লিঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট পারিবারিক আদালত ছাড়াও রয়েছে 'ভায়োলেন্স অ্যাগেনিস্ট উইমেন অ্যাক্ট'-এর মতো বিশেষায়িত বিধিব্যবস্থা, যেগুলো কেবল নারীদেরই সুরক্ষা দেয় এবং সব সময় অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় পুরুষদের।

সম্ভবত নারীবাদীদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কৌশল হলো এই প্রসঙ্গ বিচ্যুতি বা Deflection। এটি তাদের কুতর্কের অন্যতম উপায়। বিচ্যুতির একটা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আরবান ডিকশনারিতে-

*Deflecting Argument হলো-যখন কেউ আপনার বিরুদ্ধে কিছু বললে সেখান থেকে দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। নিজেদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তারা চূড়ান্ত নিশ্চুপ থাকবে; বরং তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে চলে যাবে অন্য আলোচনায়। কেননা,

তারা খুব ভালো করেই জানে-যদি মূল বিষয়ে কথা বলে কিংবা অভিযোগের জবাব দিতে যায়, তাহলে তাদের আসল উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যাবে।'

____________★★★__________

নারীবাদের উপেক্ষিত ইতিহাস

ফেমিনিজমকে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই আমেরিকার সুপ্রজননবিদ্যা (Eugenics) আন্দোলন কীভাবে নারীবাদ, নাৎসিবাদ এবং ইহুদি গণহত্যাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা খতিয়ে দেখতে হবে। নারীমুক্তির নাম করে এই মতবাদ কীভাবে হাজার হাজার জার্মান ও লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের হত্যা করতে সহায়তা করেছিল, তার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা বাদ দিয়ে ফেমিনিস্ট ইতিহাসের কোনো পাঠই সম্পূর্ণ হতে পারে না।
১৮৩৩ সালে ইংলিশ ম্যান ফ্রান্সিস গ্যাস্টন তার ইনকুয়েরিস ইনটু হিউম্যান করেন। মেরিয়াম ওয়েবস্টার-এর সংজ্ঞানুযায়ী-

'সুপ্রজননবিদ্যা হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতি বা প্রজাতির বংশগত গুণাগুণ উন্নত করে।'

এই সুপ্রজননবিদরা প্রস্তাব করেছিল-বংশধারা উন্নয়নের পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং অযোগ্য মানবধারা বিলুপ্ত করে দেওয়া হোক।

প্রস্তাবটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই আমেরিকার অভিজাত বর্ণবাদী আর শিক্ষাবিদরা সুপ্রজননবাদকে লুফে নেয়। তাদের তহবিল এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ইউজেনিক্সে রীতিমতো তুফান শুরু হয় সমগ্র আমেরিকাজুড়ে। বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢালে কার্নেজি ইনস্টিটিউশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন, হারিম্যান রেলওয়ে ফরচুনসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। ১৯০৩ সালে সেন্ট লুইসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রথম সুপ্রজননবাদ সংস্থা আমেরিকান ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির দিক থেকে এটিই ছিল এ জাতীয় সভার প্রথম নমুনা। সভার পর আন্দোলনের বেগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

বিখ্যাত সুপ্রজননবিদ চার্লস বি ড্যাভেনপোর্ট ১৯১০ সালে ইউজেনিক্স রেকর্ড অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালের মধ্যেই আমেরিকান সুপ্রজননবিদ্যা আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অগ্রদূতে পরিণত হয় ড্যাভেনপোর্ট। ড্যাভেনপোর্টের সংস্থাটির কাজ ছিল সারা দেশের পরিবারগুলোর বংশগত তালিকা সংগ্রহ করা। বলা একান্তই বাহুল্য যে, এই তালিকার প্রয়োজন হয়েছিল সমাজের অগ্রগামী পরিবার থেকে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য পরিবারগুলোর বংশপরম্পরাকে আলাদা রাখার অসৎ ও বর্ণবাদী উদ্দেশ্যে।

১৯১২ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক ইউজেনিক্স সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমেরিকান ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের সুপ্রজননবাদ সমিতির প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রিন্সটন, জন হপকিনস, হার্ভার্ড, কর্নেল, ইয়েল; এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেও বিশিষ্ট চিকিৎসক, বিচারক, আইনজীবী ও শিক্ষাবিদরা উপস্থিত হয়েছিল এই সভায়। আমেরিকান ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের প্রতিবেদনে বলেছিল-ত্রুটিযুক্ত মানবশ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য। তারা এই শ্রেণির মানবসন্তানকে নৈতিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং সমাজের বোঝা হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের চিহ্নিত 'যোগ্য' মানবসম্পদের কাতারে অবলীলায় বাদ পড়ে দুর্বল, নিঃস্ব, অপরাধী, মৃগীরোগী, মানসিক বিকারগ্রস্ত, জীণকায়, রোগাক্রান্ত, বিকৃত, ইন্দ্রিয় ত্রুটিযুক্ত অসংখ্য মানুষ। কোনো রকম রাখঢাক না রেখে রীতিমতো তালিকা ধরে এসব মানুষকে সমাজের জন্য ভয়াবহ সংকট বলে সাব্যস্ত করা হয়। 'গুরুতর' এই সমস্যা সমাধানে তাদের টোটকা ছিল সামাজিকভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিতদের নির্মূল করে ফেলা। 'যোগ্য ও টেকসই সমাজ' নির্মাণে তাদের প্রস্তাবিত সমাধানের মধ্যে ছিল-

- অযোগ্যদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ।
- খোজাকরণ বা বন্ধ্যত্ব গ্রহণে জোর প্রয়োগ (Sterilization)।
- বিয়ে-শাদি নিয়ন্ত্রণ এবং বহুবিবাহ প্রতিরোধ।
- যন্ত্রণাহীন উপায়ে হত্যা।
- নন ম্যালথুনিসিয়ান মতবাদ তথা গর্ভধারণে কৃত্রিম হস্তক্ষেপ।

যন্ত্রণাহীনভাবে মৃত্যুর সোজাসাপ্টা অর্থ হচ্ছে (Euthanasia) মানবহত্যা। ভেবে দেখুন। মৃগী, অ্যালার্জি, হাঁপানি, অন্ধত্ব কিংবা অন্য কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত অগণিত আদম সন্তানদের অপরাধীদের মতো অকাতরে মেরে ফেলতে চেয়েছিল এই তথাকথিত সমাজসেবকের দল। সে সময় রাজ্যে রাজ্যে 'জিম ক্রো' নামে জাতিগত বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী আইন কার্যকর হয়েছিল। বিবাহকে গুরুতর অপরাধ হিসেবেও বিবেচনা করা হতো অনেক রাজ্যে। সুপ্রজননবিদ্যা মতবাদ অনুসারে কেউ যদি এই পৃথকীকরণের বিরোধিতা অথবা ভিন্ন জাতির বিবাহ আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই সংগত।

সুপ্রজননবাদীদের এই প্রস্তাব গণহত্যার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। কিন্তু ফেমিনিজমের সাথে এর সম্পৃক্ততা কোথায়?

বিখ্যাত নারীবাদী মার্গারেট স্যাঙ্গার সুপ্রজননবিদ্যার খুব স্পষ্টবাদী সমর্থক ছিলেন। সারা দুনিয়াব্যাপী তিনি পরিবার পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠাতা এবং ফেমিনিজমের আইকন হিসেবেও পরিচিত। মিসেস স্যাঙ্গারের অনেকগুলো লেখা মার্গারেট স্যাঙ্গার প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। পরবর্তী সময়ে তার রচনাবলি এবং বক্তৃতার উন্মুক্ত অনলাইন আর্কাইভ গড়ে তোলা হয় সেই প্রকল্পের আওতায়। সে সময় তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আফ্রো-আমেরিকানদের নির্মূল করার জন্য বন্ধ্যত্ব ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগের অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। সচেতন মহল থেকে দাবি ওঠে, মার্গারেট স্যাঙ্গার সচেতন বর্ণবাদী এবং গণহত্যার ইন্ধনদাতা। স্যাঙ্গারের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীরা অবশ্য চিরাচরিত প্রতারণার পথ ডিফ্লেকশনের মাধ্যমে তার কুৎসিত আদর্শকে সব সময় অস্বীকার করেছে। কিন্তু প্রবাদপ্রতিম এই নারীবাদীর বক্তব্যগুলোতে একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা সম্ভব, কতটা বিকৃত আর নির্মমতায় ঠাসা ছিল তার চিন্তাজগৎ। তিনি যেসব বিষয়কে সমর্থন করেছিলেন, তার প্রায় সবগুলোই এখনও তুমুল বিতর্কিত।

স্যাঙ্গার **১৯১৭** সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রণকে প্রকাশ্য সমর্থন জানান, নিজের ম্যাগাজিনকে ব্যবহার করেন শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ ও গণহত্যাকারী সুপ্রজননবাদের পক্ষে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে। স্যাঙ্গার দরিদ্রদের ঘৃণা করতেন। **১৯১৭** সালের ডিসেম্বরে তিনি মেট্রোপলিটন ম্যাগাজিনে 'বার্থ কন্ট্রোল-মার্গারেট স্যাঙ্গারস রিপ্লাই টু থিওডোর রুজভেল্ট' শিরোনামে এক কলাম লেখেন। এতে তিনি দরিদ্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন- 'বস্তিবাসীর সন্তান জন্মদানের চেয়ে বড়ো জাতীয় অপব্যয় আর কিছুই হতে পারে না।'

১৯১৯ সালের মার্চে তিনি আরেকটি সম্পাদকীয়তে লেখেন- 'বর্তমানে চিকিৎসক, সমাজকর্মী, বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা, মানবতাবাদী সংস্থা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে অযোগ্যদের মধ্যে জাতিগত অগ্রগতির যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তা কার্যত অপচয়। বলতে গেলে সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলো নিতান্ত তুচ্ছ কাজে তাদের সময় ঢালছে। অযোগ্যদের বাস উপযোগী করে তোলার এই অনর্থক কাজে তারা ততদিন সময় দিতে থাকবে, যতদিন না মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা বলে-এটি নিরর্থক।'

১৯২৫ সালের **২৫** মার্চে একটি বিশেষ নৈশভোজে বক্তৃতা দেওয়ার সময় স্যাঙ্গার বলেছিলেন- 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তার অভিবাসন আইনের বদৌলতে পৃথিবীর অগ্রদূতে পরিণত হয়েছে। বেশির ভাগ ব্রিটিশ শাসনকর্তারা যেভাবে চেয়েছিল, আজ মার্কিন সরকার ঠিক সেভাবেই অভিবাসন আইন প্রয়োগ করছে। সরকার যেভাবে আইন প্রয়োগ করে মানসিক ভারসাম্যহীন, শারীরিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ, নিঃস্ব এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের এই দেশে

প্রবেশ থেকে বিরত রেখেছেন, আমরা তা সমর্থন করি। শুধু এতটুকু আশা করি যে, তারা এই আইনগুলোর পরিধি আরেকটু বৃদ্ধি করে দেশের ভেতরকার অযোগ্য ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিরোধ করবে।'।

_______★★★_______

লিবারেলিজম কেনো চায় না আপনি নিকাব পরিধান করুন?

'তাদের পর্দার আড়াল থেকে বের করে আনো, যেখানে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে।'

মুসলিমদেরকে যারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দমন করতে চায়, তারা অনেকদিন থেকেই মুসলিম নারীদের অবস্থাকে তাদের প্রধান হাতিয়ার বানিয়েছে, বিশেষত হিজাব। ঔপনিবেশিক সময়কালে মিশরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা তাদের উপনিবেশবাদ বৈধ করার জন্য মুসলিম নারীদের পর্দা এবং ইসলামে নারীদের অধিকারের কথা বলতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুশ প্রশাসন ইরাক যুদ্ধ শুরু করার মূল কারণ হিসেবে নারী মুক্তির কথা বলেছে। উপনিবেশবাদ-বিরোধী দার্শনিক এবং বিপ্লবী ফ্রাঞ্জ ফ্যাননের মতে, ঔপনিবেশিক আমলে আলজেরিয়ায় ফরাসি রাজনৈতিক নীতি ছিল- 'আলজেরিয়ায় সামাজিক কাঠামো ধ্বংস করতে এবং তাদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করতে হলে প্রথমেই নারীদের দিকে নজর দিতে হবে। নারীদের অবশ্যই পর্দার আড়াল থেকে বের করে আনতে হবে, যেখানে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে।

ঔপনিবেশিক সময় থেকে শুরু করে বর্তমান উদার পাশ্চাত্যেও একইভাবে বিভিন্ন সময় মুসলিম নারীর নিকাবকে নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে অন্যদের মধ্যে মুসলিমদের প্রতি ভয় এবং তাদের সাথে দূরত্ব তৈরি করা হয়েছে। গত বছর যুক্তরাজ্যে এমপি স্যারাহ ওলাস্টন (Sarah Wollaston) প্রকাশ্যে স্কুলগুলোতে নিকাব নিষিদ্ধের আহ্বান জানান। যার কারণে দেশব্যাপী নিকাবের বিষয়টি নতুনভাবে আলোচনায় আসে। সে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়নি কিন্তু সামাজিকভাবে নিকাব যে নিষিদ্ধ করা উচিত এমন ধারণার বীজ জনমানসে বুনে দেওয়া হয়েছে। এরপর থেকে জাতীয় বিতর্কের নামে এবং সংবাদপত্রে 'সভ্য সমাজের কি নিকাবের বিষয়টি কঠোরভাবে নেওয়া উচিত না?' এমন শিরোনাম প্রকাশের মাধ্যমে সেই বীজের পরিচর্যা করে চলছে। বিভিন্ন কারণ ও অজুহাত দেখিয়ে এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা নিয়ে মানুষের মনে ধারণা আরও বদ্ধমূল করা হয়েছে। মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে-নিষিদ্ধ না করলেও অন্ততপক্ষে নিকাবকে দৃঢ়ভাবে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

নিকাব-বিরোধীরা নিকাবকে নারীর সুরক্ষা এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের পথে বাধ্য হিসেবে দেখে। নিপীড়িত হওয়া, কাজে বাধাগ্রস্ত হওয়া এবং এমনকি নিকাবের উপস্থিতিতে আশেপাশের লোকজনের অস্বস্তিবোধ-সহ নিকাবের বিপক্ষে যুক্তি হিসাবে এমন হাজারো অজুহাত দেখায় তারা।

গত সপ্তাহে লন্ডনে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের জন্য বিখ্যাত এমন একটি স্কুলে একজন শিক্ষার্থীর নিকাবকে নিষিদ্ধ করা হয়। কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে ছাত্র-শিক্ষকের খোলামেলা আলোচনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন যেকোনো পোশাকের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নেবে। সেই সাথে অস্ট্রেলিয়াতেও

'নিরাপত্তার' উদ্দেশ্যে সংসদে নিকাব পরিহিতা নারীদের আলাদা করা হয়েছে। শর্তে বলা হয়েছে যে যদি কোনো মুসলিম নারী ক্যানবেরায় সংসদীয় কার্যক্রম দেখতে চায়, তবে তাকে আলাদাভাবে কাচের রুমে বসে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, নিকাব পরিহিতা নারীকে সব ধরনের চেক করা হলেও তাকে সেই কাচের রুমের মধ্যে অবস্থান করতে হবে। অথচ এসব কাচের রুমে বাচ্চারাও থাকে। মূলত স্কুলের বাচ্চাদের জন্য এ রুম নির্ধারিত। যদি এই নারীরা আসলেই নিরাপত্তা ঝুঁকি হয়ে থাকে, স্কুলের বাচ্চাদের সাথে একই রুমে কেন তাদেরকে রাখা হয়? আসলে এটি একান্তই নিকাব ও শারিআহর প্রতি ঘৃণা থেকে করা হয়।

To cover up, or to cover-up?

উদারপন্থী দেশগুলো পর্দার ওপর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ার জন্য অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব পরিকল্পনাসমূহ তাদের নীতির সাথেই সাংঘর্ষিক। নিকাব পরিহিতা নারীদেরকে তারা বিভ্রান্তকারীদের শিকার কিংবা ভুক্তভোগী হিসেবে আলাদা শ্রেণিভুক্ত করে এবং তাদেরকে উদ্ধারের স্লোগান দেয়। এটা স্পষ্ট যে তাদের এমন দাবির মূলে অন্য কোনো গোপন উদ্দেশ্য আছে।

নিকাবের বিরুদ্ধে স্ব-বিরোধী যুক্তিগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি-

১! 'নিকাবের মাধ্যমে পুরুষকে 'যৌন উত্তেজক' হিসেবে ছোট করা হয়, আবার পুরুষরাই নিকাব পরতে নারীদেরকে বাধ্য করে', তার মানে কি তাহলে পুরুষরা নিজেদের ছোট করার জন্য নারীদের ওপর নিকাব আরোপ করেছে?

২! নিকাব নারীদের নিজ পরিচয়ে পরিচিত হতে না দিয়ে অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়', কিন্তু ওই একই লোকেরা আবার দাবি করে যে নিকাব পরিহিতা নারীদের দিকে সকলের নজর যাচ্ছে এবং নিকাব পরিহিতা নারীদের দেখে 'জনগণ ভীত'।

৩! 'নিকাব নারীদের ওপর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়', এ কারণে কি যেসব নারী নিকাব পরতে চায় তাদেরকেও জোর করে নিকাব থেকে বের করে আনতে হবে?

৪! 'নিকাব নারীদের ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা', কাজেই একজন নারী যদি নিকাব পরতে চায় তবে তার সে পছন্দকেও অস্বীকার করা উচিত?

৫! 'নিকাব নারীকে যৌন বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করে', তাই মুসলিম নারীদের আরও খোলামেলা পোশাক পরতে এবং তাদের নগ্নতাকে প্রকাশ করতে বাধ্য করা উচিত? সে ক্ষেত্রে নারী যৌন বস্তু হবে না?

৬! 'নিকাব একজন নারীকে অসামাজিক করে তোলে', কাজেই নিকাবকে হয় নিষিদ্ধ করতে হবে অথবা তাদেরকে বাড়িতে আবদ্ধ করতে হবে?

৭! 'নিকাব নারীর যোগাযোগকে বাধাগ্রস্ত করে', বিশেষত যখন কোনো নিকাব পরিহিতা নারী আমাদের সাথে অনা কোনো উপায়ে যোগাযোগ করতে চায়। মুখ খুলে না আসলে কথা বলতে না পারাটা কীসের ইঙ্গিত দেয়?

৮! 'নিকাব পরিহিতা একজন নারী নিপীড়িত এবং তাঁর কোনো মূল্য থাকে না', কিন্তু তারাই বলেন নিকাব পরিহিতা নারীরা নাকি 'বিপজ্জনক এবং প্রতারক'।

৯! 'নিকাবের ফলে নারীদের স্বাভাবিক যৌন চাহিদাকে বিপজ্জনক মনে হয়'। যারা নিপীড়িত তারাই আবার বিপজ্জনক?

১০! 'নিকাবকে নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে', পাশাপাশি তারা নিকাবকে পুরুষের যৌনতা নিয়ন্ত্রণের বিকল্প হিসেবেও দেখে।

১১! 'নিকাব পুরুষের জন্য চরম অবমাননাকর। কেননা নিকাব প্রমাণ করে যে পুরুষেরা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম নয়' হ্যাঁ, একই কারণে একটি দরজার তালা যেকোনো অপরিচিত ব্যক্তির জন্য অবমাননাকর।

১২! 'নিকাব নারীর দেহ নিয়ে সামাজিক উদ্‌বেগের প্রতীক', কাজেই চলুন নারীদের দেহ নিয়ে জাতীয় বিতর্কের আয়োজন করি। (!)

টেলিগ্রাফে যখন 'সভ্য সমাজের কি উচিত না নিকাবের বিষয়টি কঠোরভাবে নেওয়া?' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হলো তখন তারা কি ভেবেছিল 'অসভ্য' মুসলিমরা নিজেদের ঈমানের সাথে আপস করে যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই শুধু তারা বলেছে বলে মেনে নেবে? তাদের নিজেদের দাবিই প্রমাণ করে যে নিকাবের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব আসলে নিকাবকে নিয়ে নয়। যেমনটা ভিক্টর হুগো লিখেছিলেন, 'পুণ্যের একটি পর্দা থাকে আর বিদ্বেষের থাকে মুখোশ'। আর আমরাও সামনে দেখতে পাব যে পর্দার বিরুদ্ধে অভিযানের মুখোশের আড়ালে এক নোংরা

বিদ্বেষ লুকিয়ে আছে। কেবল নিকাব পরিহিতা নারীর আশপাশের কয়েকজন অস্বস্তি বোধ করে বলে তারা নিকাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি। পর্দার বিরুদ্ধে এটি কোনো যৌক্তিক কারণ হতে পারে না। বরং লিবারেলিজম আসলে তার সাথে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক আদর্শ ইসলামের প্রতিই বিদ্বেষ লালন করে। ইসলাম হলো আল্লাহর দাসত্ব, তাকেই সর্বেসর্বা বলে মানা। আর লিবারেলিজমে ব্যক্তিই সব, সর্বেসবা। (Individualism)

জোরপূর্বক শোষণ: লিবারেলিজমের করাল থাবা

পাশ্চাত্যে লিবারেল গণতন্ত্রের অধীনে থাকা নারীদের নিকাব না পরার অধিকার যেমন আছে, ঠিক তেমনই কি নিকাব পরার অধিকার থাকা উচিত ছিল না? প্লাস্টিক সার্জারি, অজাচার (জার্মানিতে), সমকামী বিয়ের সমর্থন-সহ সকল প্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে এ লিবারেলিজম। যে কেউ সহজেই মনে করতে পারে এখানে বুঝি ব্যক্তির সকল প্রকার স্বাধীনতাকেই বৈধতা দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে লিবারেলিজম কখনোই নিকাবকে সমর্থন করবে না। লিবারেলিজম না কেবল, কোনো আদর্শই শতভাগ স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে না। তারা নিজেদের মতো করে স্বাধীনতার সংজ্ঞা বানিয়ে নেয় এবং মানুষকে স্বাধীন হতে 'বাধ্য' করে। এটি লিবারেলিজমের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং এটিই লিবারেলিজম।

লিবারেলিজমের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক জুডিথ শকলার (Judith N. Shklar) বলেন, 'লিবারেলিজম ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় যেকোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেবে। নির্দিষ্ট আদর্শের আওতায় প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সমান স্বাধীনতা থাকবে যে সে তার জীবনের সকল বিষয়ে নির্ভয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এতে কারও সমর্থনের প্রয়োজন নেই। এই বিশ্বাসই লিবারেলিজমের মৌলিক এবং একমাত্র সমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা।

_________★★★_________

নারী নেতৃত্ব

নারীর ক্ষমতায়ন কি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে?

ক্ষমতাসীনদের সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত, বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর নয়। নারীবাদীরা অভিযোগ করে যে নারীরা ক্ষমতায়ন এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে বলে নারীদের ক্ষমতায় যাওয়া উচিত। তাদের মতে, প্রশাসনে নারীর উত্থান এবং প্রবেশাধিকার বাড়ানো হলো 'সামাজিক ন্যায়বিচার' এর অংশ।যদি নারীরা ক্ষমতায় না যায় তবে নারীর ওপর ইচ্ছামতো আইনি নিষ্পেষণ চালু রেখে পুরুষতন্ত্র আজীবন টিকে থাকবে, তাদের আধিপত্য থেকে যাবে স্বমহিমায়। নারীবাদী ফসেট সোসাইটি (Fawcett Society) বলেছে, "ক্ষমতার শীর্ষ চূড়ায় নারী অনুপস্থিত [...] যদি আপনি টেবিলে না থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই মেনুতে থাকতে হবে"।

এসব দাবি করার সময় নারীবাদীরা ভুলে যায় ক্ষমতার শীর্ষে পুরুষ থাকলে যদি নারীকে মেনুতে থাকতে হয়, তাহলে গুটিকয়েক সেসব ক্ষমতাধর পুরুষ বাদে বাকি সব পুরুষকেও মেনুতেই থাকতে হয়। সব পুরুষ সমান নয়-তাদের মধ্যে বুদ্ধি, দায়িত্ব, শক্তি, সম্পদ, চেহারা এবং শ্রেণির পার্থক্য আছে। শুধু বিশেষ একটি অভিজাত শ্রেণিই নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পায়। ক্ষমতায় থাকা একটা ক্ষুদ্র অংশ সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতিনিধিত্ব করে এমন বলা যেমন হাস্যকর, ঠিক তেমনই ক্ষমতায় থাকা নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সকল নারীর প্রতিনিধিত্ব করবে বলে দাবি করাটাও একইভাবে হাস্যকর। তারা জুলুমতন্ত্র বদলাতে চায় না বরং এর মধ্যেই ফিট করতে চায়। অন্যায়-অপশাসনের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান না রেখে সে অপশাসনের প্রশাসনেই তারা একটি চেয়ার দাবি করে। নারীবাদীরা যদি তাদের ন্যায়বিচারের আহ্বানে আন্তরিক হতো, তবে নারী জাতির মধ্যে এ শ্রেণি বৈষম্য নিজেরাই তৈরি করতে চাইত না। বরং সম্পূর্ণরূপে একটি বিকল্প ব্যবস্থার দাবি নিয়ে আসত।

নারীদের উপকারের জন্য যা করা উচিত তা না করে যা করা অনুচিত তাই করে নারীবাদীরা। নারীবাদীদের মৌলিক একটি দাবি হলো, পুরুষরা প্রতিনিয়ত নারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। কারণ হলো, তারা পুরুষ। নারীরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে, কারণ তারা নারী। তাদের মতে, পুরুষই সমস্যা, বিপরীতে নারী হলো সমাধান। নারীদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এ ধরনের সেক্সিস্ট অভিযোগ করা হলে নারীবাদীরা কি ক্ষুব্ধ হতো না? উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নারী না থাকলেই যে পুরুষরা প্রতিটি সময় নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করে তা সর্বৈবই মিথ্যা। উদাহরণস্বরূপ এই বছরের শুরুর দিকে, 'Counting Women In' সংস্থা থেকে 'Sex and

Power ২০১৩: Who runs Britain?' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয় 'ক্ষমতা থেকে নারীদের বাদ দেওয়া নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর'।

ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য নারীর ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। নারী ক্ষমতায়ন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না।

প্রশাসনে নারী অবস্থান আন্দোলন জুলুমতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে

নারীবাদীরা দাবি করে যে নারী ক্ষমতায় যাওয়ার মানেই হলো নারীর অধিকার নিশ্চিত করা, সুযোগ বৃদ্ধি করা। বাস্তবে নারীদের ইচ্ছার কোনো পাত্তাই নেই তাদের কাছে। তারা নিজেদের মতো কিছু আইন বানায়, এরপর তা প্রকাশ করে দাবি করে যে এগুলোই আসলে নারীর জন্য ভালো, আর কিছুই ভালো না। সব সেক্সিস্ট। জুলুমতন্ত্র, পুঁজিবাদের এ যুগে পুরুষরা যেসব নিপীড়ন ভোগ করে তারা চায় নারীরাও তাই ভোগ করুক। এটাই নাকি সম্মান। যদি জ্যাক পাহাড়ের নিচে পড়ে যায় তবে কি জিলকেও পরে যেতে হবে?

নারীবাদীরা দাবি করে নারীরা ক্ষমতার নতুন সংজ্ঞা দেবে। ২০১৩ তে ফোর্বস কর্তৃক বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর একশজন নারীর নামের তালিকা প্রকাশকালে ফোর্বস এর মহিলা সম্পাদক বলেন, তিনি পুরোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সংজ্ঞায়নে নয়; বরং ক্ষমতার নতুন চিন্তা লালনকারী নাবীদের নির্বাচন করতে চেয়েছেন।

নারীবাদীরা প্রকৃত পরিবর্তন চায় না; বরং দীর্ঘদিন যাবৎ যার দায়ে তারা পুরুষদেরকে অভিযুক্ত করে আসছে ক্ষমতা আত্মসাৎ করে ঠিক একই নিপীড়নমূলক নিয়ম সবার ওপরে চাপিয়ে দিতে চায়।

নারীবাদীরা দাবি করেন, পুরুষশাসিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রেখেছে, তাদেরকে পুরুষদের ওপর নির্ভর হতে বাধ্য করেছে (কারণ পুরুষরা স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে পছন্দ করে)। নারীবাদীরা মনে করে, পুঁজিবাদ তাদের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে রেখে দিয়েছে পুরুষকে। বাস্তবে পুঁজিবাদ পুরুষের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে রেখেছে চাকরিকে। পুঁজিবাদ বলতে নারীর ওপর পুরুষের নিপীড়ন বোঝায় না, বোঝায় দরিদ্রের ওপর ধনীর শোষণ।

নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ এবং নারীবাদ দুই আদর্শই পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করতে, Divide & Rule করতে সর্ববস্থায় একাট্টা। নারীবাদী আন্দোলনকে তুঙ্গে তোলার অন্যতম কারিগর সিমোন ডি বোভোয়ার (যার বই অনুবাদ করে 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' নামে প্রকাশ করেছেন হুমায়ূন আজাদ) বলেছেন, "কোনো নারীরই সন্তান লালনপালনের জন্য ঘরে থাকা উচিত নয়

[...] ইচ্ছা করলেও নারীদের এমনটি করা উচিত নয়। স্বেচ্ছায় এমন পছন্দের উদাহরণ তৈরি হলে অনেক নারীই এমনটা বেছে নেবে। এভাবে নারীকে ভুল পথে টেনে নেওয়া হয়"।।

_________★★★________

পুরুষতন্ত্র:নারীদের চাহিদা

নারীরা আসলে সেক্সিস্ট পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। গুল এবং কুফার প্রকাশির রিসার্চে বলা হয়, তারা অনেক ব্যক্তির ওপর রিসার্চ চালিয়েছে। তারা বিভিন্ন নারীর কীসের প্রতি আকর্ষণ, আকর্ষণের পেছনের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে।

সেক্সিস্ট শব্দটিকে খারাপভাবে দেখা হলেও, সেক্সিজম আমাদের সবার মধ্যেই আছে। সেক্সিজমের মানে হলো কেবল নারী-পুরুষের ভিন্নতাকে স্বীকার করে নেওয়া, তাদেরকে ভিন্নভাবে কাজে লাগানো এবং ভিন্ন আশা রাখা। সবাই বিষয়টি তাদের অন্তরের গহিনে লালন করে এবং আল্লাহর কিতাবেও বিষয়টি সত্য বলেই বলা হয়েছে, **'পুরুষ নারীর মতো নয়।' [আল কোরআন, ৩:৩৬]**

আগের রিসার্চগুলোতে বলা হয়েছে, বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানের মাধ্যমেই এগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দেখা যায়, নারীরা সবসময় অধিক পুরুষত্ব সম্পন্ন পুরুষদেরকেই পছন্দ করে, শারীরিক সুস্থতার দিকেও নজর রাখে। গুল এবং কুফারের (Gul and Kupfer) গবেষণা অতীত গবেষণার সাথে সম্পর্কিত হলেও তারা একটু ভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা করেছেন। তারা বলেন যে, সেক্সিস্ট পুরুষ, বিশেষ করে যেসব পুরুষ 'হিতৈষী সেক্সিজম' প্রদর্শন করে তাদের প্রতি নারীদের ঝোঁক বেশি থাকে। কারণ নারীরা মনে করে এ ধরনের পুরুষ নারীদের প্রতি বেশি যত্নবান, নিজেদের যাবতীয় বিষয়াশয় তারা স্ত্রী ও পরিবারের পেছনে ব্যয় করতে চায়।

ইসলাম যে পুরুষতন্ত্রের কথা বলে তাঁকে বোঝানোর জন্য 'হিতৈষী সেক্সিজম' একটি সুন্দর টার্ম হতে পারে। পুরুষতন্ত্রের সংজ্ঞা খুবই সাধারণ একটি সামাজিক সিস্টেম যেখানে পুরুষ নারীর চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রায় সব সমাজব্যবস্থাই পুরুষতান্ত্রিক ছিল। মুসলিম হিসেবে আমাদের এতটুকুই বোঝা জরুরি যে রাসুলুল্লাহ-এর সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। সে সমাজে নিঃসন্দেহে পুরুষরা নেতৃত্বে ছিল, নারীদের চেয়ে পুরুষদের ক্ষমতা বেশি ছিল।

আল্লাহও এমন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কথাই খুব পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন,

-

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।' [আল কোরআন, ৪:৩৪]

কিছু এপোলজিস্টের 'সৃজনশীল' সব অনুবাদকে বাদ দিলে, আয়াতের শাব্দিক অর্থ খুব পরিষ্কার। 'কাওওয়ামুন আলা' খুব পরিষ্কার শব্দ। আল্লাহ নারীর ওপর পুরুষকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কেননা তিনি এভাবেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের কাজও ঠিক করে

দিয়েছেন। কেবল তাই না, উদাহরণ হিসেবে রাসুলুল্লাহকেও প্রেরণ করেছেন। কোরআন-সুন্নাহ যা দেখিয়েছে, তা-ই হিতৈষী পুরুষতন্ত্র। পুরুষরা তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণেই নেতৃত্বে থাকবে। তারা নারীদের খেয়াল রাখবে, নিরাপত্তা দেবে, যেকোনো বিপদাপদ থেকে সাধ্যমতো রক্ষা করবে, সন্তানদের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করবে ইত্যাদি। এ পুরুষতন্ত্রের কথাই ইসলাম বলে। এ পুরুষতন্ত্রই সবার জন্য উপকারী।

আল্লাহ নারী-পুরুষকে ভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য ভিন্ন, কিন্তু সম্পূরক যোগ্যতা দিয়ে বানিয়েছেন, এটি আল্লাহর অন্যতম একটি প্রজ্ঞা। নারী-পুরুষ এভাবেই সভ্যতা, বিশ্বকে গড়ে তোলে।

নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রকে স্বভাবতই একটি জঘন্য সিস্টেম হিসেবে দেখে। তাদের মতে, পুরুষ নিজের স্বার্থে ও নারীদেরকে ধ্বংস করার জন্য নারীদের ওপর পুরুষতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের পুরুষতন্ত্র আসলে নারীবাদীদের সৃষ্ট কাল্পনিক বুগিম্যান। হ্যাঁ, স্ত্রী ও কন্যার শরিয়াহ প্রদত্ত অধিকার হরণ করে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা পুরুষ অবশ্যই আছে। কিন্তু এটি কোনো সিস্টেম হয়ে ওঠেনি। পুরুষরা জাতিগতভাবে কোনোদিন নারীদেরকে ধ্বংসের উদ্যোগ নেয়নি। কিছু নারী তাদের স্বামী ও পুত্রের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করলে আমরা তাকে 'নারীতান্ত্রিক বৈষম্যমূলক সিস্টেম' বলে চালিয়ে দিই না।

যদিও হিতৈষী সেক্সিজম রোমান্টিক এবং শৌখিন, কিন্তু নারীরা যে কেবল এসবই চায় তা নয়। আগের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে সেক্সিস্ট পুরুষ কর্তৃক নারীদের স্বাধীনতা, মুক্তি এবং ব্যক্তিনিয়ন্ত্রণের (পশ্চিমা মানদণ্ডে) অধিকার হরণকেও তারা ভালো নজরেই দেখছে। বিষয়টি লিঙ্গ-সমতাকেও প্রভাবিত করছে।

হ্যাঁ, অবশ্যই এ সিস্টেম অসাধারণ। একজন স্বামী জীবন দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করবে, তাঁর রক্ত, ঘাম ও অশ্রুর মূল্য দেবে। এবং স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসবে, অনুগত হবে এবং মান্য করবে। এটি কমনসেন্স।

এ ধরনের বৈশিষ্ট্য যে নারী ও পুরুষের মধ্যে আছে, তাঁর প্রতিই আকৃষ্ট হ্যা বিপরীত লিঙ্গের মানুষ। সংক্ষেপে বললে, স্বামী রোজগার করবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে, অন্যদিকে স্ত্রী মায়ের ভূমিকা পালন করবে এবং আগলে রাখবে। নারী পুরুষ সত্তাগতভাবেই এমন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এমনই হয়ে এসেছে। হাজার বছর ধরে চলে আসা এ রীতিকে কেবল তারাই অস্বীকার করে যারা 'বুঁদ' হয়ে আছে আধুনিক সব ব্যাখ্যায়। এ ধরনের পুরুষকে নারীরা কেন পছন্দ করে, কেন আকৃষ্ট হয় তা বোঝার জন্য গুল এবং কুফার (Gul and Kupfer) বেশ কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছে। দেখা গেল, যারা সেক্সিস্ট পুরুষদেরকে পছন্দ করে তারাই এমন পুরুষদেরকে পছন্দ করে যারা স্ত্রীদের খেয়াল রাখে, তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার মানসিকতা

লালন করে এবং সম্পর্কন্নোয়নে কাজ করে। এ নারীরা ভালোবাসায় অন্ধ কেউ ছিল না, তারা তাদের চোখ খোলা রেখেই, মনকে মুক্ত রেখেই তাদের অভিমত জানিয়েছে।
অন্যভাবে বললে, স্মার্ট নারী জানেন কোন ধরনের পুরুষ তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের খেয়াল রাখবে। স্পষ্টতই, নারীদের অধিকারের জন্য হম্বিতম্বি করা পুরুষদের তর্জনগর্জন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বাস্তব জীবনে তারা একজন দায়িত্বশীল বাবা, স্বামী হয়ে উঠতে পারে না।

যে নারীদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে তাদের অনেকেই কমবেশি নারীবাদী। তাই তাদেরকে কম 'জাগ্রত' নারী বলার সুযোগ নেই। খুবই অবাক করা বিষয়।

যতই চেষ্টাই করুক, নারীবাদীদের অন্তর থেকে নারীত্ব মুছে ফেলা এত সহজ বিষয় নয়। আল্লাহ তাদেরকে এভাবেই বানিয়েছেন, এটিই ফিতরাহ। যেসকল নারীরা সেক্সিস্ট পুরুষদেরকে পছন্দ করছে, তারা কি নারীজাতির ধ্বংস ডেকে আনতে চাইছে? নাকি তারা জানেই না সেক্সিস্ট পুরুষ কেমন হয়? তা অবশ্যই না। তারা বুদ্ধি খাটিয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভারসাম্য রক্ষা করছে। তারা মনে করে, পরিবারকেন্দ্রিক চিন্তা করে, পরিবার এবং স্ত্রীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে এমন পুরুষই তাদের সঙ্গী হিসেবে বেশি যোগ্য। তারা স্বাধীনতা চায়নি, সেই স্বাধীনতা যা পশ্চিমা নারীবাদী পুরুষরা তাদেরকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। পশ্চিমের ঠিক করে দেওয়া স্বাধীনতার চেয়ে এটাকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি।

প্রথমত, বোঝাই যাচ্ছে সেক্সিস্ট পুরুষের প্রতি আকর্ষণ কোনো ব্রেইনওয়াশিং এর কারণে তৈরি হয় না কিংবা ভুল চিন্তার কারণেও না। তারা শুধু ফিতরাহর দিক থেকেই সেক্সিস্ট পুরুষ পছন্দ করে তা নয়; বরং তারা যুক্তি দিয়েও বোঝে যে তাদের ও তাদের পরিবারের জন্য সেক্সিস্ট পুরুষই বেশি জরুরি।

দ্বিতীয়ত, দেখা যায় যে নারীদের অধিকারের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তর্জন গর্জন করা অধিকাংশ পুরুষরাই বাস্তব জীবনে অকর্মণ্য ও নারীদের প্রতি সহিংস। গবেষকরা বলেন, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক নারীই বিষয়টি তুলে এনেছেন। তাই যেকোনো কিছুর মধ্যে তারা সেক্সিস্ট পুরুষদেরকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন।
নারীদের নারী হয়ে ওঠার এখনই সময়। পশ্চিমা আধুনিকতার কাছে নিজের অনন্যতা, স্বাভাবিক চাহিদাকে বন্ধক দেবেন না। পুরুষদেরও সময় হয়েছে পুরুষ হয়ে ওঠার এবং পৃথিবীকে আবার হিতৈষী সেক্সিজম উপহার দেওয়ার। পৃথিবীর আজ তাই দরকার।

_______★★★_______

নারীবাদের প্রতিক্রিয়া

ফেমিনিস্টরা শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিল, নারীবাদকে আন্দোলন হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কেবল নিজেদের মতামতই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা ছিল পুরুষ সহযোগীদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা। সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে এবং তাদের মতবাদ ছড়িয়ে দিতে অন্যান্য আন্দোলনকেও সমর্থন দেওয়া। এসব পুরুষ সহযোগী নারীবাদীদের নিকট মেল ফেমিনিস্ট হিসেবে পরিচিত। তবে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাদের দুর্বল, নারীঘেঁষা বা অসৎ পুরুষ হিসেবেই দেখে থাকে। তাদের সম্পর্কে মানুষের এমন দৃষ্টিভঙ্গির কারণ কী? এর কারণ পুরুষ নারীবাদীরা সহযোগী হিসেবে কাজ করেন না। কার্যত তারা ব্যবহৃত হয় নারীবাদীদের চামচা ও অনুগত গর্দভ হিসেবে।

অধিকাংশেরই ধান্দা থাকে কীভাবে ফেমিনিস্টদের অন্দরমহলে প্রবেশ করা যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ঠাঁই হয় 'বন্ধুমহলে'। অনেক সময় তাও জোটে না। তবে এমন মেল ফেমিনিস্ট অবশ্যই আছে, যারা নারীবাদীদের সাথে বাস্তবিকই সম্পর্কে জড়ায়; এমনকি কেউ কেউ তাদের বিয়ে করতেও সমর্থ হয়। যখন এমন কিছু ঘটে, এর পেছনে কারণ হিসেবে থাকে সেই দুর্বল পুরুষের অতিশয় ভালো বেতনের চাকরি, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা কিংবা উভয়টিই। লম্পট পুরুষ নারীবাদীরা এতটাই মগজধোলাইয়ের শিকার যে, নিজেদের অবস্থানের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ এবং ধ্বংসলীলা তারা অনুধাবন করতে পারে না।

মেল ফেমিনিস্ট নিয়োগের একটি উদাহরণ হলো 'হি ফর শি' আন্দোলন। এটা লিঙ্গসমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্বব্যাপী প্রচারণা অভিযান। এর লক্ষ্য হলো-নারীদের আঁচলতলে থেকে তাদের স্বার্থোদ্ধার করার জন্য পুরুষদের খাটানো। এই আন্দোলনের নাম থেকেই সেটা সুস্পষ্ট।

আদতে এর নাম দেওয়া উচিত ছিল Cucks for Chicks (মুরগিরক্ষক শেয়াল)। এই আন্দোলনের মুখপাত্র কে ছিল? একজন অতিশয় ধনী এবং স্বঘোষিত অভিনেত্রী এমা ওয়াটসন। তিনি দাবি করেন, নারীরা পুরুষের সমকক্ষ নয় এবং সব সময়ই তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। ফেমিনিজমের বিরুদ্ধে এসব ন্যায্য সমালোচনার প্রতিক্রিয়া কী?
প্রথমত, তারা সব সময়ই সমালোচককে ব্যক্তিগত আক্রমণের মাধ্যমে অপমান করে। যুক্তির পালটা যুক্তি না দিয়ে চেষ্টা করে আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে। এবরিডে ফেমিনিজম-এর লেখিকা শ্যানন রিজওয়ে 'ধর্ষণ কালচারের দৈনন্দিন ২৫টি উদাহরণ' শিরোনামে একটি কলাম লিখেছিলেন। তিনি সেখানে আলোচনার মোড়ে অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা চালিয়েছেন 'ধর্ষণ কালচার সত্য'- এই উইফোঁড় মিথ্যাচার প্রচারের মাধ্যমে। অথচ

নারীবাদী সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও RAINN মার্কিন বিচার বিভাগে ধর্ষণ কালচারকে অস্বীকার করেছে। তবুও এবরিডে ফেমিনিজম প্রতিনিয়ত এই মিথের প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। রেপ কালচার কীভাবে তৈরি হয়, তার উদাহরণ দেখাতে গিয়ে শ্যানন বলেন- 'যেসব কলেজ ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ করে, তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা।'

হাফিংটন পোস্টে ইভঅ্যানস্লার নামক এক অতি উৎসাহী The Undeniable Rape Culture of Donald Trump নামে একটি কলাম লেখেন। তার পুরো কলামটিই ছিল ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ট্রাম্পকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের জন্য রচিত। ট্রাম্পের প্রচারণা থামিয়ে দিতে ইভের এই প্রচেষ্টা ছিল বেশ গুরুতর, যদিও এর সাথে বাস্তবতার ন্যূনতম যোগ নেই। কলামটিতে সে একগাদা অভিযোগ তুলে দাবি করে- এগুলো সবকিছুই রেপ কালচার!'

ধর্ষণ কালচার ধারণাটি ইতোমধ্যেই ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তথাপি আমরা এই ধরনের ভুয়া সংবাদ-কলাম সর্বত্র দেখতে পাই। নারীবাদীরা বাস্তবে বাতিলকৃত এই ধর্ষণ কালচারের মিথ্যা প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে পুরুষদের অন্যায়ভাবে দোষারোপ ও হেয় করে, একে অব্যর্থ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে মতাদর্শিক শত্রুদের বিপক্ষে।
Manspreading ছিল পুরুষদের বিরুদ্ধে ফেমিনিস্টদের তৈরি হাস্যকর একটি প্রচারাভিযান। কিছু পুরুষ বসার সময় গোপনাঙ্গের অস্বস্তি এড়াতে পা ছড়িয়ে বসত। নারীবাদীরা একত্রিত হয়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের দাবি অনুযায়ী এভাবে বসাটা নাকি লিঙ্গবৈষম্যমূলক।

কেবল Manspreading-ই শেষ নয়, এরপর আরও বহু হম্বিতম্বি ছিল। এর মধ্যে রয়েছে ডাহা মূর্খতাপূর্ণ 'সেক্সিস্ট অফিস টেম্পারেচার'। বস্তুত নারীবাদীরা এত নিকৃষ্ট-নির্বোধ ও গোঁড়ামিপূর্ণ প্রচারাভিযান শুরু করেছিল যে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করাটাই ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ। মিথ্যার বেসাতি ছড়িয়ে হলেও সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তারা। এলোমেলোভাবে সংগঠিত অসংখ্য আন্দোলনকে তারা 'সামাজিক ন্যায়বিচার' শীর্ষক ছাতার নিচে একতাবদ্ধ করেছিল। এতে যুক্ত ছিল সমকামী নারী আন্দোলন, সমকামী পুরুষ আন্দোলন, বাতিলকৃত তৃতীয় লিঙ্গ আন্দোলন এবং প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান ইন্টারসেকশনাল নারীবাদী আন্দোলন। ইন্টারসেকশনাল নারীবাদীরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। কেননা বর্ণ, ধর্ম, বয়স, ভূমি, জাতীয়তা ও সুবিধাজনক আরও বিভিন্ন উপায়ে নারীবাদীদের বিভক্ত করেছিল এই আন্দোলন। সুতরাং বলা যায়, ইন্টারসেকশনাল নারীবাদের কারণেই নতুন নারীবাদী উপ-আন্দোলন শুরু হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে আফ্রো-আমেরিকান নারীবাদী, লাতিনা নারীবাদী, এশিয়ান নারীবাদী, আদি আমেরিকান নারীবাদী, অক্ষম নারীবাদী, তৃতীয় লিঙ্গ নারীবাদী এবং

আরও অসংখ্য বিকাশমান নতুন নতুন দল-উপদল। বছরখানেকের মধ্যে কেকস্থানি নারীবাদী আন্দোলন গঠিত না হলেই বরং আমি অবাক হব।
এসবের মাঝে সবচেয়ে সরেস ব্যাপার হলো-নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাদের অজান্তেই ভুক্তভোগী এবং নিপীড়ন প্রতিযোগিতা তৈরি করেছে।

১৯৫০-৬০ সালে নাগরিক অধিকার নেতারা আশেপাশের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল। এটা সেই সময়ের কথা, যখন কৃষ্ণাঙ্গদের পৃথকীকরণ আইন মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহকে ভাবা হতো মারাত্মক অপরাধ। এমনকি বাসের মতো অবাধ গণপরিবহনেও কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ সীমিত করে দেওয়া হয়েছিল। সরকারি স্কুল, কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে যাওয়া থেকেও বঞ্চিত ছিল তারা। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মূল নাগরিক অধিকার নেতারা বাস্বাধীনতা রক্ষা, পৃথকীকরণ, জাতিগত সহিংসতা এবং গোঁড়ামি বন্ধ করার জন্য প্রতিবাদ করছিল। সামগ্রিকভাবে তাদের সেই প্রতিবাদকে ব্যর্থ বলার সুযোগ নেই।

এবার ২০১৭ সালের দিকে লক্ষ করা যাক। এ সময়ের সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলন কর্মীরা নিরাপদ পরিবেশের নামে পৃথকীকরণ সমর্থন করেছে। শ্বেতাঙ্গ এবং ভিন্ন মতাদর্শীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অসংখ্য অপরাধ করার পক্ষে নিজেরা কথা বলেছে এবং তাদের সমর্থকদেরও এ কাজে উৎসাহ দিয়েছে। সর্বোপরি তারা সক্রিয়ভাবে বাকস্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। ১৯৬০ সালে বার্কলে বাকস্বাধীনতার পক্ষে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু ২০১৭ সালের সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধারা বাকস্বাধীনতার বিপক্ষে প্রতিবাদ করেন। হলফ করে বলতে পারি, এসব দেখলে খোদ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ও ম্যালকম এক্স ব্যথিত হতেন। বর্তমান সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধা এবং তাদের নারীবাদী গুরুরা ভিন্নমতকে ঘৃণিত বক্তব্য হিসেবে আখ্যা দেন এবং কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। শুধু এ কারণেই বহু লোকের চাকরি গেছে, অন্যায়ভাবে গ্রেফতার আর লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে অনেকে।

নারীবাদ প্রায় সমস্ত পশ্চিমা সরকার এবং আইনিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে মাধ্যমিক কলেজ এবং প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সর্বস্তরে ছড়িয়ে গেছে এই উগ্রবাদী আন্দোলন। ছোটোবেলা থেকেই সমতার শিক্ষা দেওয়ার বদলে এরা শিশুদের অন্তরে ভয়াবহ পুরুষবিদ্বেষ গেঁথে দেয়। জীববিজ্ঞানের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তনের তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে রদ করা সত্ত্বেও এখনও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিশুদের সেসব শেখানো হচ্ছে। ইয়ান মাইলস চেন্ডং ২০১৭সালের ১৩ এপ্রিল 'Australian Govt Booklet Tells Gender Diverse Teens to Consider Sex Change Surgery' নামে একটি অনুচ্ছেদ লেখেন। চেন্ডং সেখানে বলেন-'অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের সরকার কিশোর-কিশোরীদের হরমোন থেরাপি এবং লিঙ্গ পরিবর্তনমূলক শল্যচিকিৎসার জন্য উৎসাহিত করে-এমন একটি দিকনির্দেশনা সৃষ্টির জন্য অর্থায়ন করেছিল।'

পরের মাসে আমান্ডা প্রেস্টিগিয়াকোমো Daily Wire-এর একটি নিবন্ধে প্রতিবেদন করে-

'অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ায় প্রায় ৩০০টি বিদ্যালয় নতুন লিঙ্গ পরিবর্তন নীতি নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেছে, যেটা পিতা-মাতার সম্মতি ছাড়াই ছয় বছর বয়সি শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ পরিবর্তন করার সুযোগ দেবে।'

আমি যেমনটি বলেছিলাম, শিশুদের রীতিমতো লিঙ্গ পরিবর্তনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এটি এতটাই ভয়াবহ যে, ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকান শিশুবিশেষজ্ঞ কলেজ, স্বাস্থ্যসেবাবিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও আইনজীবীদের শিশুদের লিঙ্গ পরিবর্তন করার রাসায়নিক ও শল্যচিকিৎসার নীতি প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানায়।

জৈবিক বাইনারি বৈশিষ্ট্য XY ও XX হলো নারী-পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণকারী, তারা কোনো লিঙ্গব্যাধি নির্ধারণকারী নয়। মানব বৈশিষ্ট্য আদর্শকে নারী অথবা পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষের লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যগতভাবে বাইনারি, যার উদ্দেশ্য প্রজনন ও বিকাশ। এই নীতি স্বতঃস্ফূর্ত। মানুষ জৈবিক লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু লিঙ্গ সম্পর্কিত ধারণা তখন কারও থাকে না। লিঙ্গ বা নারী-পুরুষ চেতনা সম্পূর্ণভাবে একটি সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধারণা; জৈবিক বস্তুনিষ্ঠ নয়। কেউই পুরুষ কিংবা নারীর অনুভূতি নিয়ে জন্মে না। এই চেতনা সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয় এবং অন্যান্য বিকাশগত প্রক্রিয়ার মতো এটিও একটি শিশুর মানসিক অবস্থা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং শৈশবের বিরূপ অভিজ্ঞতার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। যেসব ব্যক্তি নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের কিংবা মাঝামাঝি কোথাও চিহ্নিত করে, তাদের তৃতীয় লিঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা জৈবিক পুরুষ বা নারীই রয়ে যায়। কোনো পুরুষের নিজেকে নারী মনে করাটা বড়োজোর বিভ্রান্তিকর চিন্তা। এটাকে শারীরিক নয়, মানসিক সমস্যা আকারেই দেখা উচিত।

লৈঙ্গিক সংকট নিয়ে তৈরি হওয়া কৃত্রিম টানাপড়েন রোধে নানা ধরনের কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ছে। এই বেহুদা তৎপরতার অংশ হিসেবে বামপন্থি ও নারীবাদী প্রতারক দল যুগপৎভাবে শিশুদের স্কুলগুলোতে তাদের কুকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।
এরচেয়েও আতঙ্কজনক হলো, নারীবাদীদের তৈরিকৃত সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলন সক্রিয়ভাবে শিশু যৌন নিপীড়নের পক্ষে সমাজের অনুমোদন লাভের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যেটা পেডোফিলিয়া (Pedophilia) হিসেবে পরিচিত।

২০১৫ সালে বামপন্থিরা শিশু ধর্ষণকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখানোর জন্য এতই আগ্রহী ছিল যে, তারা স্বস্বীকৃত শিশু যৌন নিপীড়ক টড নিকারসনকে নিবন্ধ প্রকাশের প্ল্যাটফরম দিয়েছিল।

নিকারসন সেই প্ররোচনামূলক নিবন্ধে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, কেন আপনার শিশু যৌন নিপীড়ন মেনে নেওয়া উচিত। এর বছর দুয়েক পরে শিশু যৌন নিপীড়করা নিজেদের Pedosexual হিসেবে পরিচিত করে এবং সমর্থন লাভের জন্য LBGT+ ট্যাগ পরিবর্তন করে LBGTP+ করার প্রচেষ্টা চালায়। এমনকি টুইটারে তাদের #pedosexual নামে হ্যাশট্যাগও রয়েছে। আরও মারাত্মক ব্যাপার হলো, Heart Progress Foundation নামে শিশু নির্যাতনের পক্ষে একটি সংস্থাও তৈরি করেছিল তারা।

উপরন্তু, ২০১৭ সালের ২৮ মার্চ শিশু নিপীড়ক নিক মার্টিনেজ তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে 'হার্ট প্রোগ্রেস ফাউন্ডেশন: পরমতসহিষ্ণুতার ক্রমবর্ধমান যুগ' নামে একটি ব্লগ পোস্ট লেখে। সেখানে সে বলে- 'বামপন্থা গ্রহণ এবং অন্যান্য গ্রুপে যোগদান করার যাত্রায় আমি হার্ট প্রোগেস ফাউন্ডেশন নামের একটি গ্রুপ খুঁজে পেয়েছিলাম। হার্ট প্রোগ্রেস ফাউন্ডেশন নতুন একটি বৈপ্লবিক গ্রুপ, যেটা পেডোসেক্সুয়ালদের সংকটাপন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পেডোসেক্সুয়াল ব্যক্তিদের সমর্থনকারী আর্নস্ট স্টেইনারের উদ্যোগে ২০১৬ সালে গঠিত এই গ্রুপটি অনেক উদ্দীপনা অর্জন করেছে এবং এর সদস্যও প্রতিনিয়ত বাড়ছে। অতীতের সমকামী আন্দোলনের মতো পেডোসেক্সুয়াল আন্দোলনও জনপ্রিয় এবং এর সাম্যের পক্ষে লড়াই করতে আরম্ভকরেছে। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিন, এশিয়ান, সমকামী, উভয়কামী- যা-ই হই না কেন, আমরা প্রত্যেকেই গ্রহণযোগ্যতা এবং পরমতসহিষ্ণুতা যুগের অংশ।'

আপনি ঠিকই পড়েছেন। এটা শিশু নির্যাতনের পক্ষে গঠিত একটি সক্রিয় গ্রুপ, যেখানে তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। এর আগে ২০১৩ সালের মে মাসে, আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক সংগঠন প্রকাশ্যে পেডোফিলিয়াকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত যৌনপ্রবণতা হিসেবে অভিহিত করে। তাদের ভাষায়- DSM Diagnositic and Statistical Manual of Mental Disorders। কিন্তু একজন স্বতন্ত্র সাংবাদিক এটা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার পর পেডোফাইলদের পক্ষ থেকে এত বেশি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এসেছিল যে, আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক সংগঠন পিছিয়ে আসে এবং এর সংজ্ঞা পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অপমান এড়াতে তারা বলে-'অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।'

নারীবাদী এবং স্বস্বীকৃত পেডোফাইল লিনা ডানহ্যামকে ২০১৬ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আমি কেন ডানহ্যামকে পেডোফাইল বলছি? এর কারণ ডানহ্যাম তার নট দ্যাট কাইন্ড অব গার্ল নামক আত্মজীবনীতে নিজের বোনকে যৌন নিপীড়নের জন্য প্রস্তুত করার কথা স্বীকার করেছিল-'সে যখন বড়ো হচ্ছিল, আমি তাকে সময় এবং আদরের জন্য ঘুস দিয়ে প্রভাবিত করতাম। যদি সে আমাকে মোটরসাইকেলে বসা মেয়েদের মতো মেকআপ করানোর অনুমতি দিত, তাহলে

তাকে হাফ ডলার দিতাম। আর ঠোঁটে পাঁচ সেকেন্ড চুমু খেতে পারলে দিতাম তিনটি ক্যান্ডি। আমাকে আরাম দিলে সে টিভিতে যা খুশি দেখার অনুমতি পেত। মূলত যৌন শিকারিরা শহুরে ছোটো একটি মেয়ের সাথে প্রেম করার জন্য যেসব করে থাকে, আমিও তার সাথে সেগুলোই করতাম।'

গ্রন্থের অন্য অংশে সে আরও বলে- 'আমি ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত আমার বোনের সাথে এক বিছানায় থাকতাম। সে একা ঘুমোতে ভয় পেত এবং প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় জিজ্ঞাসা করত- আমি তার সাথে থাকতে পারব কি না। তার অনুনয় এবং মুখ ভার করা দেখে আমার ভীষণ আনন্দ হতো। শুরুতে তাকে না করতাম ঠিকই, কিন্তু সব সময়ই শেষ পর্যন্ত নরম হতাম। আমি যখন অ্যান সেক্সটন পড়তাম বা রিটার্নস অব স্যাটারডে নাইট লাইভ দেখতাম, সে তার উষ্ণ আর্দ্র শরীর আমার পাশে এলিয়ে দিত।'

ডানহ্যামের আত্মজীবনীটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৫ সালের শেষের দিকে। সে হিসেবে সাক্ষাৎকারের আগে ক্লিনটনের জানা উচিত ছিল, ডানহ্যাম একজন স্বস্বীকৃত যৌন নিপীড়ক। কিন্তু আদতে এতে তাদের কিছু যায় আসে না। তবে জাতীয় টিভিতে হিলারি ক্লিনটনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে একজন যৌন নিপীড়ককে অনুমতি দেওয়ার অর্থ আমার কাছে শিশুদের যৌন নির্যাতকদের উৎসাহিত করা। আপনি কি চান কিছু নারীবাদী অথবা সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধারা আপনার সন্তানদের ব্রেইনওয়াশ করুক এটা বলে যে, শিশু যৌন নিপীড়ন এবং লিঙ্গ পরিবর্তনের শিক্ষা যথার্থ?

পশ্চিমা সমাজে এমনভাবে নারীবাদী মতাদর্শ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এসব হিটলার ইয়ুথ প্রতিষ্ঠাতারাও এসব দেখলে ঈর্ষায় পুড়ে মরত। হিটলারের থার্ড রাইখ টিকেছিল মাত্র দশ বছর। আর নারীবাদের রমরমা রাজ্য এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলমান।

___________★★★__________

নারীবাদ নাকি সেক্সিস্ট

সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে নারীবাদী সাংবাদিক এবং স্বঘোষিত 'রাজনৈতিক লেসবিয়ান' জুলি বিন্ডেল বলেন যে তিনি যদি পারতেন তাহলে তিনি সব পুরুষকে ওয়ার্ডেন দিয়ে একটি ক্যাম্পে রাখতেন এবং তাদের নারী আত্মীয়রা লাইব্রেরির বইয়ের মতো তাদেরকে দেখতে আসতেন।

বিন্ডেল দ্য গার্ডিয়ানেও লেখালেখি করেন। তাকে একটি সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়-'নারী মুক্তির আন্দোলনের সাথে কি হেটারোসেক্সুয়ালিটির [২] মৃত্যু হবে?' তার উত্তর ছিল-'হ্যাঁ হবে, যদি না পুরুষরা তাদের কাজ ঠিক করে করছে, তাদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং নিজেদের আচরণ ঠিক করছে। আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমি আসলে তাদের সবাইকে একধরনের ক্যাম্পে রাখব। সেখানে তারা সবাই কোয়াড বাইক বা সাইকেল অথবা সাদা ভ্যানে করে ঘুরে বেড়াতে পারবে। আমি তাদের গাড়ির বিভিন্ন চয়েজ দেবো। কিন্তু তাদেরকে পর্ন দেখতে দেবো না, তারা মারামারি করতে পারবে না। সেখানে অবশ্যই আমাদের ওয়ার্ডেন থাকবে! যেসব মহিলা তাদের ছেলে বা পুরুষ প্রিয়জনকে দেখতে চান তারা সেখানে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করতে পারবেন। ইচ্ছা হলে তাদেরকে সাথে নিয়ে ঘুরতে যেতে পারবেন। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর তাদেরকে আবার ক্যাম্পে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হবে; লাইব্রেরির বইয়ের মতো।

তাঁর এ মাস্টারপ্ল্যান নারীবাদী মহল সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু 'তাকে 'র‍্যাডিকেল' বা উগ্রবাদী নারীবাদী বলা হয়। পুরুষদের প্রতি বিন্ডেলের মতো ঘৃণা প্রায় সব নারীবাদীর মধ্যেই আছে। তারা মনে করে, পুরুষদের আসলে এভাবেই ঘৃণা করা উচিত।

'নারীরা করলে তা আর সেক্সিজম থাকে না...'

নারীবাদী আন্দোলনকে অনেক সময় 'পুরুষবিদ্বেষী' আন্দোলনও বলা হয়। অনেক নারীবাদীই এমন ট্যাগিং-এর বিরোধীতা করেছেন। তবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীবাদী পুরুষবিদ্বেষকে নৈতিক এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার বলে মনে করে। নারীবাদী এক্টিভিস্ট এবং সাংবাদিক রবিন মর্গান বলেন '

আমার মতে পুরুষবিদ্বেষ খুব কার্যকরী রাজনৈতিক অবস্থান। আমাদের এ অবস্থানকে শ্রদ্ধা করা উচিত। নির্যাতিত শ্রেণির অবশ্যই অধিকার আছে নির্যাতনকারী শ্রেণিকে ঘৃণা করার।

মর্গানের মতো নারীবাদীদের ভাষ্য হলো, তাদের এমন ঘৃণা প্রচার করার অধিকার আছে কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া দেখানোর অধিকার পুরুষের নেই। পুরুষদের মেনে নিতে হবে সব, কেননা

তারা নির্যাতক। একটা সময় এমন ছিল না। উগ্রবাদী নারীবাদীরাই একসময় মানবজাতির কোনো শ্রেণিকে ঘৃণা করার বিরুদ্ধে কথা বলত, অথচ এখন তারা-সহ LGBTQ আন্দোলনের প্রায় সবাই এমন করাকেই যৌক্তিক মনে করে।

আইডেন্টিটি গ্রুপ রাজনীতির প্রচলিত ভাষায়, যখন 'নিপীড়িত' গোষ্ঠী ধরে নেওয়া 'নিপীড়ক' গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রেণিবিদ্বেষ প্রচার করে, একে বলা হয় 'বিপরীত নির্যাতন'। নারীবাদের ক্ষেত্রে একে বলা হয় 'বিপরীত সেক্সিজম' (Reverse sexism)

.... কারণ পুরুষরা প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের শিকার হয় না।'

নারীবাদীরা দাবি করে 'বিপরীত সেক্সিজমে' নাকি কোনো প্রকার সেক্সিজম নেই। তাদের দাবি, সেক্সিজমে কেবল লিঙ্গের কারণে কাউকে ঘৃণা করা হয় না। এখানে তারা একটি সিস্টেমিক বৈষম্যের কথা বলে। অর্থাৎ, একটি গ্রুপ কেবল তাঁর লিঙ্গের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াশয়ে বৈষম্যের শিকার হওয়া। যেমন সরকার, আইন, অর্থনীতি ইত্যাদি। এর ওপর ভিত্তি করেই নারীবাদীরা দাবি করে, পুরুষদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার সেক্সিজম আরোপ করা হচ্ছে না। কেননা নারীরা যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়, পুরুষরা তাদের প্রতি ঘৃণার কারণে এমন কোনো বৈষম্যের শিকার হবে না। তাই এটি সেক্সিজম না।

ঠিক এ কারণেই মর্গানের মতো নারীবাদীদের কাছে নিচের উক্তিটি সেক্সিজম হবে না; বরং 'শ্রদ্ধেয়' এবং 'কার্যকরী রাজনৈতিক অবস্থান' হবে।

'পুরুষ আসলে অসম্পূর্ণ নারী। তারা একটি গর্ভপাতের প্রোডাক্ট। জিন স্টেইজে তাদের গর্ভপাত হয়েছে। পুরুষ হওয়া লজ্জাজনক, তাদের আবেগ সীমাবদ্ধ। পুরুষত্ব আসলে একটি রোগ, অনেক অনেক অসম্পূর্ণতা পুরুষত্বের মাঝে। পুরুষরা আবেগের দিক থেকে পঙ্গু। [...] একজন পুরুষকে পশু বলা আসলে তাকে সম্মান দেওয়া। সে আসলে একটি মেশিন, একটি চলাফেরা করা লিঙ্গ। -ভ্যালারিয়া সোলানাস (SCUM Manifesto)

'পুরুষতন্ত্রের অধীনে সব নারী মেয়েশিশু ভিক্টিম-অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে। পুরুষতন্ত্রের অধীনে সব নারীর ছেলেশিশু সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতক। অথবা অবশ্যম্ভাবী একজন ধর্ষক কিংবা আরেকজন নারীকে ধ্বংসের কারিগর। -এন্ড্রিয়া ডর্কিন, Our Blood
'মানবজাতিতে পুরুষের সংখ্যা কমাতে হবে। তাদেরকে কখনোই ১০%-এর বেশি হতে দেওয়া যাবে না। -স্যালি মিলার গিয়ারহার্ট, The Future if there is one is Female

প্রথমত, আসুন স্পেইডকে স্পেইড বলি। বিপরীত সেক্সিজম বলে কিছু নেই। শুধু আছে সেক্সিজম। আমরা কখনো বলি না, 'বিপরীত ধর্ষণ' কিংবা 'বিপরীত সন্ত্রাস'। ভুল কাজ ভুলই, সেটাই যেই করুক না কেন, যার সাথেই করা হোক না কেন।

নারীবাদীরা বলে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য হলেই তা সেক্সিজম। যদি তর্কের খাতিরে এ সংজ্ঞাকে সঠিক ধরেও নিই, তাহলেও সুরাহা হয় না। নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য বাইনারি কোনো বিষয় না। পুরুষদের ওপর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য হয় না বলাটা একটি মিথ্যাচার। বাস্তবতা অনেক ভিন্ন। বর্ণবাদের ক্ষেত্রে অ-সাদা পুরুষ কিংবা খেটে খাওয়া মজদুর-এদেরকে বিবেচনায় আনলে সমীকরণ বদলে যায়। পুরুষদের জীবনকেও নারীদের থেকে কম মূল্য দেওয়া হয় (সামরিক ক্ষেত্রে নিয়োগ, কোনো উদ্ধারকাজে 'নারী ও শিশু প্রথমে' ইত্যাদি)। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও কোটায়, একই অপরাধে ভিন্ন শাস্তি, আত্মহত্যা দমন, ক্যান্সার রিসার্চ, পারিবারিক সহিংসতার রিসার্চ, কাজের কারণে মৃত্যুর হার-সহ অনেক অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতি বৈষম্য লক্ষ করা যায়।

সেক্সিজমের সংজ্ঞার ব্যাপারে নারীবাদীদের অবস্থান মেনে নিলে বলতে হয় কাউকে প্রথমে অবশ্যই কোনো না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তারপর তাকে আমরা সেক্সিজম ধরে নেবো এবং তা রুখতে কাজ করব। অন্যভাবে

বললে, নারীবাদীদের মতে যদি পুরুষজাতি অধীনস্থ জাতি হয়, নারীতন্ত্রের অধীনে পেষণ হয়, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বৈষম্যের শিকার হয় তাহলেই কেবল সে নিরাপত্তা পাবার যোগ্য বিবেচিত হবে। এর বাইরে তাঁর সাথে যাই করা হোক না কেন সেটা নিপীড়ন বলে গণ্য হবে না। এ ধারণা পুরো মানবতাকেই হুমকির মুখে ফেলে দেয়। পুরো তত্ত্বটির মানে হলো যদি সব মানুষকে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয় তাহলে কোনো এক পক্ষকে শোষক ও আরেক পক্ষকে শোষিত হতে হবে। এটা তারা লিঙ্গের ভিত্তিতে আরপ করে। রীতিমতো নারী-পুরুষের মধ্যে যুদ্ধ। আসলেই ভাবার বিষয়, নারীবাদীরা আসলেই সুবিচার চায় নাকি নিজেদের কাল্পনিক 'নির্যাতনের' প্রতিশোধ নিতে চায়।

নির্যাতিতদের অধিকার আছে নির্যাতক শ্রেণিকে ঘৃণা করার-এ কথাটি নৈতিকভাবেই ভুল। এখানে ব্যক্তিকে ঘৃণা করা যায়, পুরো শ্রেণিকে না। কেননা ব্যক্তির কাজের জন্য শ্রেণি দায়ী না। এভাবে পৃথিবীর যে কারও সব প্রকার ঘৃণা বৈধ হয়ে যায়। কোনো মুসলিমের যেকোনো কাজের কারণে ইসলামোফোবিয়া বৈষ হয়ে যায় কিংবা কোনো ইহুদির কোনো কাজের জন্য এন্টিসেমেটিজম।

বিপরীত সেক্সিজম শব্দটি নারীবাদের সেক্সিজমের সমালোচনার জন্য ব্যবহার করা হলেও টার্মটি সমস্যাযুক্তই। এ টার্মের মানে হলো নারীবাদীরা আসলে তাদের ওপর হওয়া সেক্সিজমের জবাব, প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ সেক্সিজম দেখায়। নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার বয়ে দাঁড়ায় এ টার্ম। সেক্সিজমের বদলে বিপরীত সেক্সিজম শব্দটি ব্যবহার করাই নারীবাদীদের দাবিকে একটি যৌক্তিকতা দিয়ে দেয়। অথচ সেক্সিজম শব্দটির এমন কোনো ইতিহাস নেই। কোনো পুরুষ কোনো নারীবাদী কর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নারীবিদ্বেষী হয়ে ওঠেনি। যদি এমনটা হয়, তাহলে তাকে আমরা কী বলব? তাকেও কি বিপরীত সেক্সিজম বলা হবে?

'...কারণ নারীরা পুরুষের মতো দমনপীড়ন চালাতে সক্ষম না।'

গিয়ারহার্টের পুরুষ কমিয়ে ফেলার বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে ভয়ংকর। কিন্তু তিনি ৯০% পুরুষকে হত্যা করে ফেলার জন্য আন্দোলনের ডাক দেননি। তাঁর আরেক আর্টিকেলে তিনি লিখেছেন, তিনি চান ক্রমান্বয়ে পুরুষ জাতির ৯০% কে শেষ করে দিতে। এটা নাকি পুরুষদের সম্মতিক্রমেই হবে এবং মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই। গিয়ারহার্ট যে মানসিকতা নিয়ে এ দাবিটি করেছেন তা তিনি স্বীকারই করতে চান না। তাঁর মতে, নারীরা পুরুষের ওপর নির্যাতন করতেই পারে না। নারীদের মানসিকতাই নাকি এমন। এ যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই তিনি বলেন যে নারী পুরুষকে দমন করতে পারে না। সেক্সিস্ট হওয়া তো দূরের কথা।

'নারীদের প্রাধান্য দিতেই হবে, এটিই সত্য, বাস্তব [...] আমার মনে হয়, নারীবা জাতিগতভাবেই নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করবে না। সাদারা অন্য সব রঙের মানুষদের ওপর, পুরুষরা নারীদের ওপর প্রভাব বজায় রাখতে যেভাবে জীববিজ্ঞানকে সামাজিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তাও নারীরা করবে না। [...] নারীদেরকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় পুরুষতন্ত্রের নির্যাতন পুরুষদেরকেই ফিরিয়ে দিতে তারা কি পারবে তা করতে? আমার মনে হয় না। [...] যদি আমরা আসলেই দেখতে চাই নারীরা কীভাবে ক্ষমতা ও সরকারকে কাজে লাগায়, তাহলে আমাদের উচিত তাদেরকে একটি সিস্টেমে সুযোগ দেওয়া যেখানে তারা নিজেদের মূল্যবোধ অনুসারে কাজ করতে পারবে।০১

নারী নেতৃত্বের এ ধারণা শুনতে ভালো লাগলেও শুভঙ্করের ফাঁকি থেকে যায়। প্রমাণের চেষ্টা করা হলো ভালো-খারাপ বৈশিষ্ট্য কোনো না কোনোভাবে লিঙ্গের সাথে সংযুক্ত। মানে পুরুষ-মাত্রই এমন হবে, নারী-মাত্রই অমন হবে। তিনি এখানে বর্ণবাদের কথাও টেনে এনেছেন। তার মানে কি তিনি মনে করেন সাদা মানুষ মানেই এমন হয়?

উদাহরণস্বরূপ, গিয়ারহাট পুরুষের বন্ধনের ভয়াবহতা সম্পর্কেও সচেতন করেছেন : 'আলাদা কোনো পুরুষ এখানে সমস্যা না। [...] মূল সমস্যা হলো পুরুষদের পারস্পরিক বন্ধন। তাদের পারস্পরিক বন্ধন ও প্রতিশ্রুতি একটি আর্মি, গ্যাং, সার্ভিস ক্লাব, কর্পোরেশন, সংগঠন কিংবা কোনো ক্রীড়াদলের খেলোয়াড়দের মতো। [...] পুরুষদের পারস্পরিক বন্ধনের শক্তি ও স্পিরিট যেন নির্ভর করে নারীদেরকে অবমাননা এবং নারীদের মূল্যবোধ, যোগ্যতাকে ধ্বংস করার ওপর। তারা সবসময় নারীদেরকে নিয়ে ঠাট্টা মশকারি করে। তাদের অভিজ্ঞতা এবং আবেগকে যেন ধ্বংস করা দরকার। আর পুরুষদের এ বন্ধন যেন নারীদেরকে ধ্বংস করেই সফলতার মুখ দেখবে।

পুরুষরা পুরো নারীজাতির প্রতি ঘৃণা দেখালে তাকে বলা হয় Misogyny, কিন্তু নারীবাদীদের দাবি তারা পুরুষ জাতিকে পুরুষের মতো করে ঘৃণা করতে পারে না। এটা নারীত্বের সাথেই যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ দাবি সত্য না। নারী-পুরুষ উভয়েই মানুষ এবং মানুষমাত্রই ভালো-খারাপ দুটো করারই ক্ষমতা রাখে। এমনকি তারা নিজেদের ভুলগুলো বৈধ করার চেষ্টাও করে।

_________★★★_________

পুরুষদের প্রতি জাতিগত ঘৃণা কি অবিচারের সমাধান?

নারীবাদীরা ধরে নিয়েছে পুরুষরাই কেবল 'নিপীড়ক', নারীরাই কেবল 'নিপীড়িত' এবং নিপীড়ক শ্রেণির অনুকরণ করাই হলো সমাধান। কাল্পনিক বা বাস্তব জাতিগত ঘৃণা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নয়। নির্যাতিতরাই যে একসময় তাদের সাথে হওয়া একই নির্যাতন করে, ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেশি করে নিপীড়ক শ্রেণি হয়ে যায় তাঁর উদাহরণ পৃথিবীতে অনেক।

ব্রাজিলিয়ান দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রিয়ারের মতে,

'নির্যাতিতরা নির্যাতন থেকে বাঁচার চেষ্টা না করে নিজেরাই নির্যাতনকারী হয়ে উঠতে চায়। [...] তারা পুরুষদের সবকিছুকেই সফলতা বলে মনে করে, আবার তাদের দৃষ্টিতে পুরুষরাই নিপীড়ক। এর মানে কী?

১৪শ শতকের মুসলিম দার্শনিক ইবনে খালদুনও এ বিষয়টি লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, এ ধরনের অনুকরণ আসলে নির্যাতনকারীর শ্রেষ্ঠত্বকেই আরও বেশি করে তুলে ধরে। যে নির্যাতন করবে সেই শ্রেষ্ঠ-এমন একটি ধারণা শক্তিশালী হয়।

'পরাজিতরা সবসময় তাদের বিজয়ীদের পোশাক, আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং আচারের অনুসরণ করতে চায়। মানুষ যাদের দাস হয়ে থাকে, যাদের কাছে পরাজিত হয় তাদেরকেই সফল এবং শ্রেষ্ঠ মনে করে। [...] হয়তো বিজয়ীর প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধার কারণে তারা বিজয়ীকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অথবা পরাজয়ের কারণ হিসেবে তারা নিজেদের দোষ দেখে না, মনে করে বিজয়ী শ্রেষ্ঠ বলেই তারা পরাজিত হয়েছে। তারা মনে করে না কোনো সাধারণ শক্তির কাছে তাদের পরাজয় হতে পারে। এ বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ়ভাবে চেপে বসতে পারলেই হলো, এটা সকল দায়মুক্তির টনিক হয়ে যায়। এভাবে বিজয়ীর সাথে মিশে যাওয়ার প্রবণতা, তাদের সবকিছু অনুসরণ করার প্রবণতা ও তাদের একজন হয়ে ওঠার প্রবণতা বাড়তে থাকে। এমন মানসিক দাসত্ব অজ্ঞাতেই মানুষের মনে চলে আসে। আবার এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসও মাথায় চেপে বসতে পারে যে, বিজয়ীর বিজয়ের কারণ তার শক্তি, সক্ষমতা নয়; বরং তার বিশ্বাস, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গি। নিজেদের 'নিম্ন' সংস্কৃতি থেকে বের না হলে বিজয় অর্জন সম্ভব না। মানুষ মনে করতে থাকে, বিজয়ীর অনুসরণ করেই তারা একদিন বিজয়ী হয়ে উঠবে।

_________★★★_______

নির্যাতিতরা দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত নয়

অনেকের মনে হতে পারে, 'আরে! এ যুক্তি দিয়ে নারী মুক্তির সকল রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নারীরা কি নিজেদের মুক্তির জন্য কোনো ব্যবস্থা নেবে না?' অবশ্যই নেবে। কোরআন-হাদিস ও হাজার বছর আগের আলেমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ভেঙে ভেঙে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কোন জুলুম থেকে কীভাবে মুক্তি মিলবে। ইসলাম ভুলকে ভুল হিসেবে দেখে, জুলুমকে জুলুম হিসেবে দেখে; কে করল তা কোনো বিষয় না, কার সাথে হয়েছে তাও না। কোনো রাগ বা অসন্তুটি ছাড়াই দমন হয় সব প্রকার অনাচার।

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' [আল কোরআন, ৫:৮]

'হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও; তবে আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবগত।'[আল কোরআন, ৪:১৩৫]
নিপীড়ক গোষ্ঠীর একজন হওয়া নির্বিচারে যা ইচ্ছা তাই করার লাইসেন্স না, কোনো শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠিও না।
বিদায় হজের ভাষণে রাসুল বলেন-
'কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। [...] কোনো কালোর ওপর কোনো সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'
একই বাক্যেই রাসুল বিপরীতটাও বলেছেন-
'কোনো অনারবের কোনো আরবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। [...] কোনো কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোনো সাদার ওপরে।' তিনি ঠিক করে দিয়েছেন!শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড, 'তাকওয়া ও সৎ কাজ।'

'নির্যাতিত' জাতির অংশ হওয়ার কারণে কেউ দায়মুক্ত হয়ে যায় না। অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর দায়িত্ব থেকেই যায়। পরিবার, সমাজ ও সুবিচারের জন্য তাঁর অনেক কিছু করার আছে। আল্লাহ তাঁর কিতাবে হাশরের মাঠে হিদায়াহ থেকে বঞ্চিত দুর্বল এবং উদ্ধত-দুই দল লোকের মধ্যকার আলোচনা উল্লেখ করেছেন:

'[...] আর তুমি যদি দেখতে জালিমদেরকে, যখন তাদের রবের কাছে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা অহংকারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা মুমিন হতাম'। যারা অহংকারী ছিল তারা, তাদেরকে বলবে, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, 'তোমাদের কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী'।' (আল কোরআন, ৩৪:৩১-৩২)

এ দুই দল আল্লাহর সামনেই তর্ক করতে থাকবে। নিপীড়িতরা তাদের হিদায়াহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য নিপীড়কদেরকে অভিযুক্ত করবে। কিন্তু নিপীড়করা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে, নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের জীবনে আল্লাহর আইন গ্রহণ করে নিতে পারত। কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য না। মজার বিষয় হলো, আল্লাহ এ দুই দলের জন্যই একই উপাধি উচ্চারণ করেছেন, 'জালিমুন'। অর্থাৎ জালিম বা নিপীড়ক।

কেবল ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে চললেই সুবিচার নিশ্চিত হয় না, নিপীড়কের ভুল কাজ অনুসরণ করাও সুবিচার না। সুবিচারের জন্য দরকার সঠিক নির্দেশনা, অপরিবর্তিত মানদণ্ড ও সত্য এবং সঠিক কর্মপন্থা। সত্যিকার একটি নৈতিক মানদণ্ড ছাড়া নারীবাদীদের আসলেই সফলতার কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা কেবল অযৌক্তিক অবস্থানকেই নৈতিক ভিত্তি বানিয়ে নিয়েছে, 'সমতা'। এর বাইরে তাদের কোনো নৈতিক অবস্থান নেই যার ভিত্তিতে আমরা অন্যায়, সুবিচার ইত্যাদির সংজ্ঞা ঠিক করব। যখন সমতাকেই আপনি নিজের একমাত্র দাবি বানিয়ে নেন, তখন কোন ক্ষেত্রে সমতা চান, কেন চান তাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। কেবল পুরুষের মতো হতে পারাই যদি সফলতা হয়, তাহলে আর কোনো সুবিচার অবশিষ্ট থাকে না। কেবল জুলুমের একটি চক্রই চলতে থাকবে, কখনো নারী ও কখনো পুরুষ হবে নিয়ন্ত্রক।

আগুনের সাথে আগুন দিয়ে লড়াই করলে, সব ধ্বংস হবে।

_________★★★________

নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর

নারীবাদের প্রধান দুই শত্রু হলো বিবাহপ্রথা ও পারিবারিক মূল্যবোধ। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীবাদীরা এই দুটিকেই ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি, ধ্বংসাত্মক ফেমিনিস্টরা পুরুষ ও সমাজের কাঁধে দোষ চাপিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে, পুরুষ দমনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। কিন্তু ফেমিনিজম খোদ নারীদের ওপর কী প্রভাব ফেলে, তা নিয়েও আলোচনা করা জরুরি।

দীর্ঘ সময় পর হলেও নারীরা ফেমিনিস্টদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম বুঝতে শুরু করেছে। বিয়েপ্রথাকে আক্রমণ করার সময় থেকেই ফেমিনিস্টরা জানত, নারীদের সুখী এবং ভালোবাসাপূর্ণ পারিবারিক জীবন থেকে বের করে আনতে হলে অবশ্যই সামনে একটা মুলা ঝুলিয়ে দিতে হবে। ফলে তারা ক্ষণিকের সুখ লাভের জন্য উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের সুবিধাসমূহ প্রচার করতে শুরু করে। উচ্ছৃঙ্খলতার 'কুফল' রোধকল্পে সমানতালে চলতে থাকে জন্মনিরোধক আর ঢালাও গর্ভপাতের প্রচারণা। অথচ বাস্তব জীবনে যত্রতত্র গর্ভধারণ এবং লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম ভয়াবহ এবং গুরুতর।

সহজ কথায়-নারীবাদীরা জন্মনিরোধক ও গর্ভপাতের মাধ্যমে কুকর্মের প্রাকৃতিক পরিণতি এড়ানোর টোপ দিয়ে নারীদের যথেচ্ছা ও যত্রতত্র শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে প্রলুব্ধ করেছিল। এই পরিকল্পনার অভ্যন্তরেই বেশ্যাবৃত্তিকে বলা হয়েছে লিঙ্গবৈষম্যমূলক আর অবাধ যৌনাচারকে দেওয়া হয়েছে শারীরিক স্বাধীনতার তকমা। অদূরদর্শী নারীবাদীরা কখনোই উচ্ছৃঙ্খলতার বিনিময়ে বিয়ে ও পারিবারিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেওয়ার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিণতি বিবেচনা করেনি।

এদিকে সমাজে বাধাহীন বিশৃঙ্খলার প্রভাবে বিভিন্ন অপরাধ এবং মাদকাসক্তি বেড়ে যায়। সমাজ ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে জ্যান্ত নরকে। এগুলো কি বিশেষ কোনো পরিণতি বয়ে আনবে? চলুন সেটাই আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই কথা বলি জন্মনিরোধক নিয়ে। আজকাল জন্মনিরোধক পিল এতটাই সহজলভ্য যে, গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা ছাড়াও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে ডাক্তাররা ব্রণ প্রতিরোধে, অনিয়মিত মাসিক; এমনকি মাসিকের পূর্বের লক্ষণসমূহের কারণেও এসব পিলের প্রেসক্রিপশন দিয়ে দেন। যদিও সাধারণভাবে জন্মনিরোধক পিল নিরাপদ, কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম নয়। যেকোনো সময় এটি ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

জন্মনিরোধকের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হলো স্থূলতা। এটা সেবনের ফলে ওজন বেড়ে যায়। কিন্তু বিষয়টাকে বরাবরই লঘু বিবেচনায় এড়িয়ে যাওয়া হয়। এমনকি অনেক বিশেষজ্ঞও একে সমস্যা বলে মনে করে না। তাহলে আমরা কেন এই বিষয়ে কথা বলছি? কারণ, গবেষণায় স্থূলতার পরিবর্তে কেবল সলিড মাস গেইন (গণকল্যাণ) পরিমাপ করা হয়। সেলফ ম্যাগাজিনের জাহরা বার্নস একবার The Truth About Birth Control Causing Weight Gain নামে ডাক্তার ইদ্রিস আবদুর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট। ডাক্তার আবদুর রহমানের ভাষ্যমতে-'সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, এটা ওজন বৃদ্ধি করতে সক্ষম।' এ ছাড়া মাউন্ট সিনাই স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর অ্যালিসা ডেক বার্নসকে বলেন-'আপনার অবশ্যই অতিমাত্রায় ওজন বৃদ্ধি করা উচিত নয়।'

২০১৪ সালের ২ জানুয়ারি কোচরান ডেটাবেজ অফ সিস্টেম্যাটিক রিভিউ-এ প্রকাশিত একটি মেটা স্ট্যাডিতে আরও বলা হয়-
'বিভিন্ন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ওপর পরিচালিত গবেষণায় ওজন বৃদ্ধির বিষয়টি মোটামুটি একই রকম। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কারণে ওজন বৃদ্ধি পায় না-এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার মতো যথেষ্ট প্রমাণ মেলেনি।'

নারী স্বাস্থ্য জার্নালিস্ট আলেক্সান্দ্রিয়া গোমেজ একবার ইয়েল ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর মেরি জেন মিনকিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তিনি বলেছিলেন- 'আজকাল স্থূলতা একটি কমন অভিযোগ। সমস্যা হলো- হরমোনাল জন্মনিরোধকগুলো কেন আপনাকে মোটা বানিয়ে ফেলবে, তা এখনও একটি রহস্য।

ডক্টর মিনকিন নিশ্চিত করেন-হরমোনাল জন্মনিরোধকগুলো কেন ওজন বৃদ্ধি করে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের তেমন কোনো ধারণাই নেই। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, এগুলো ওজন বৃদ্ধিতে সক্ষম। দুঃখজনক ব্যাপার হলো-সবাই বিষয়টি জানা সত্ত্বেও এ প্রসঙ্গে কথা উঠলে আলোচনা অন্যদিকে নিয়ে যায় এবং মূল সংকটটাই ধামাচাপা দিয়ে ফেলে। অথচ এটি একই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত।ডক্টর জয়শি ফুলকর্নি অস্ট্রেলিয়ার আলফ্রেড অ্যান্ড মনাশ ইউনিভার্সিটির একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি শুধু একজন অধ্যাপকই নন; মনাশ আলফ্রেড সাইকিয়াট্রি রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টরও বটে। এটি বিভিন্ন সেক্টরের ১০০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ মনোরোগ গবেষণাকেন্দ্র। ডক্টর কুলকর্নি পিয়ার রিভিউড জার্নাল এক্সপার্ট অপিনিয়ন অন ড্রাগ সেইফটি-তে ২০০৬ সালের জুলাই সংস্করণে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তার অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে-

'বিশ্বব্যাপী লক্ষাধিক নারী কার্যকর জন্মনিরোধক হিসেবে মুখে সেবনযোগ্য গর্ভনিরোধক পিল ব্যবহার করছেন। এখনও পর্যন্ত এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে কেবল শারীরিক দিককেই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে। অথচ এটি ব্যবহারের অধারাবাহিকতার কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে ডিপ্রেশন বা হতাশার কথা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে-হতাশার কারণ হিসেবে ওরাল গর্ভনিরোধক পিলের ভূমিকার ব্যাপারে গবেষণা রয়েছে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি। একটি পাইলট গবেষণা প্রকল্প দেখিয়েছে যে, ওরাল গর্ভনিরোধক পিল সেবনকারী নারীরা সাধারণ নারীদের চাইতে উল্লেখযোগ্যমাত্রায় অধিক হতাশাগ্রস্ত ছিলেন।'

২০১৬ সালে অ্যামেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পিয়ার রিভিউড জার্নাল JAMA PSzchiatry হতাশার সাথে হরমোনাল জন্মনিরোধকের সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণা প্রকাশ করে। এটি মূলত শার্লট ওয়েসেল, স্কোভলুন্ড এমএসসি, ডক্টর লিনা স্টেইনরড মর্চ এবং ডক্টর লার্স ভেদেল কেসিংয়ের পরিচালিত একটি যৌথ গবেষণা উদ্যোগ। গবেষণাটিতে এই ভয়ংকর তথ্য উঠে আসে-

'সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নারী হরমোনাল জন্মনিরোধক ব্যবহার করছেন। কিছু নারীর মন-মেজাজ নিয়ন্ত্রণে এসব ওষুধের প্রভাব থাকার ক্লিনিক্যাল প্রমাণ মেলা সত্ত্বেও হরমোনাল গর্ভ নিরোধকের সাথে মানসিক অস্থিরতার সংযোগ যথাযথ গুরুত্বের সাথে চিহ্নিত করা হয়নি। দেশব্যাপী এক মিলিয়নেরও বেশি নারীর ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের হরমোনাল জন্মনিরোধক সেবনকারীদের মধ্যে হতাশানিরোধক পিল ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি রয়েছে। প্রথমবার অ্যান্টিডিপ্রেশেন্ট ব্যবহার করছেন-এমন অনেকেই জন্মনিরোধকসেবী। এই হার কিশোরীদের মধ্যে সর্বাধিক।'

বিজ্ঞান এখানে সুস্পষ্ট। হরমোনাল জন্মনিরোধক নিঃসন্দেহে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে জড়িত। তবে এখানেই এর শেষ নয়। গবেষণায় পাওয়া যায়,জন্মনিরোধক সেবনের ফলে নারীদের স্তন ক্যানসারের ঝুঁকিও বেড়ে যেতে কারণের মধ্যে এটিকেও একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এভাবে-নারে। The Susan Komen Foundation স্তন ক্যানসারের অনেকগুলো

'সাম্প্রতিক সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলের ব্যবহার স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে। গবেষণা দেখিয়েছে-যখন নারীরা গর্ভনিরোধক পিল সেবন করেন, তাদের স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২০-৩০ শতাংশ বেশি।'

যদিও ফেমিনিস্টরা গণহারে নারীদের জন্মনিরোধক ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করছে, এর ভয়াবহ পরিণতি যে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি, সেটা একবারও বলছেন না; বরং প্রতিনিয়ত এসব বাস্তব তথ্যকে তারা ছোটো করে দেখায় এবং অগ্রাহ্য করে। কেননা, এসব বাস্তব তথ্যাবলি তাদের বক্তব্যকে ধসিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এবার গর্ভপাতের কুফলের ওপর আলোকপাত করা যাক।

দীর্ঘ সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব মেডিকেল বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, গর্ভপাতের সাথে ক্রমবর্ধমান ক্যানসারের সম্পর্ক নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিষয়টি একেবারেই ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। মানবদেহে ক্যানসারবিষয়ক আন্তর্জাতিক পিয়ার রিভিউড জার্নাল Cancer Causes and & Control-এর ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংস্করণ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে A Meta-Analysis of the Association Between Induced Abortion and Breast Cancer Among Chinese Females শিরোনামে। গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন জাতীয়ভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন সংস্থার ১৩ জন বিশেষজ্ঞ মিলে। বুঝতেই পারছেন, এই গবেষণা কিছু নির্বোধ ব্যক্তিরা ঘরে বসে সম্পন্ন করেনি। এটি চীনের অনেকগুলো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের পরিচালিত একটি গবেষণা। তাদের প্রাপ্ত ফলাফলও ছিল ভয়ংকর। তারা উপসংহার টেনেছেন এভাবে-
'চাইনিজ নারীদের মধ্যে অহেতুক গর্ভপাতের সঙ্গে স্তন ক্যানসারের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পৃক্ত। স্বতঃপ্রণোদিত গর্ভপাতের (Induced Abortion) সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্তন ক্যানসারের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চীনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ক্যানসার চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোর ১২ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞের মতানুসারে-একজন নারী যত বেশি মাত্রায় গর্ভপাত ঘটায়, স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি তত বেড়ে যায়। উপরন্তু ২০১৫ সালের ৭ এপ্রিল আমেরিকার শিশু বিশেষজ্ঞ কলেজ Know Your ABC: The Abortion Breast Cancer Link নামে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে বলা হয়-
'আমেরিকার শিশু বিশেষজ্ঞ কলেজ নারীদের প্রাথমিক বিষয়গুলো জানার আহ্বান জানাচ্ছে। স্তন ক্যানসারের সাথে গর্ভপাত সম্পর্কিত। যদিও মেডিকোল কমিউনিটি এই সম্পর্ক মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে। ফুল টার্ম ডেলিভারির পূর্বে এবং গর্ভধারণের ৩২ সপ্তাহের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত গর্ভপাত একজন নারীর স্তন ক্যানসার আক্রান্তের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। বিশেষত কিশোরীদের জন্য এই ঝুঁকি আরও বেশি।'

পরবর্তী সময়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে সিয়াটল শিশু হাসপাতালের ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডক্টর রেবেকা জনসনের সম্পাদিত একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করা হয়। তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন-

'প্রমাণিত তথ্য-উপাত্ত এই ইঙ্গিত দেয় যে, পূর্ণকালীন গর্ভধারণের পূর্বে গর্ভপাতের কারণে বিশ্বজুড়ে ক্যানসারের হার উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। বর্তমান গবেষণা অকালে গর্ভপাত এবং স্তন ক্যানসারের মধ্যে জোরালো সংযোগ প্রদর্শন করছে। একটির কারণে আরেকটির ওপর প্রভাব পড়ছে। যদিও আরও অনেক গবেষণা হবে, কিন্তু কিশোরীদের এখন এই ঝুঁকি সম্পর্কে জানাটা জরুরি। সকল কিশোরী এবং তাদের পিতা-মাতার স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে আমেরিকার শিশুবিশেষজ্ঞ কলেজ সুপারিশ করছে-সব মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা যেন এই তথ্য ছড়িয়ে দেন। কন্যাদের এই তথ্য বাবা-মায়ের বিশদভাবে বলা উচিত। সমস্ত স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষকদের উচিত যে, কোনো স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্লাসে এই তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা।'

এরচেয়ে ভয়ংকর কিছু আর হতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির ফলে জন্মনিরোধকের ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে গর্ভপাত বেড়ে যাচ্ছে। এবং উভয়টিই নারীদের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা আরও অনেক উপায়ে নারীদের ক্ষতিসাধন করছে। ডক্টর ক্রিস ইলিয়েডস ২০১০ সালের ১৫ জুনে এভরিডে হেলথে লেখেন-'আপনার যৌনসঙ্গীর সংখ্যা যত বেশি; এইডস, প্রস্টেট ক্যানসার, জরায়ু ক্যানসার ও ওরাল ক্যানসারের মতো যৌনবাহিত জীবনসংহারী রোগের ঝুঁকিও তত বেশি।'

তিনি আরও বলেন-'উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলোর একটি। এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে অত্যধিক মদ্যপান, জুয়া, অন্যান্য রোমাঞ্চকর আচরণ যেমন: দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলোকে।'

তবে এই বিষয়টি ২০ বছর পূর্বেই জানা গিয়েছিল, যখন ১৯৯২ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগ 'নারী কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাধিক যৌনসঙ্গী বাছাই যৌন রোগের ঝুঁকির কারণ' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকাশ করেছিল। সেই গবেষণায় বলা হয়েছিল-

'একাধিক যৌনসঙ্গী বাছাই যৌন রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়। তবে এই প্রক্রিয়া ইতঃপূর্বে চিকিৎসাধীন ব্যক্তির বাইরে কারও ওপর যাচাই করা হয়নি। যৌনসঙ্গীর সংখ্যা এবং যৌনবাহিত রোগে সংক্রমিত হওয়ার মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ রয়েছে। যেসব নারীর যৌনসঙ্গী একজন, তাদের চেয়ে যেসব নারীর পাঁচ বা ততোধিক যৌনসঙ্গী আছে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যৌন রোগের সম্ভাবনা আট গুণ বেশি। অধিকহারে যৌনসঙ্গী বাছাই এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যৌনসংগম বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌনবাহিত সংক্রামক রোগের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।'

আমরা জানি, আমেরিকাতে বয়স ২০ না পেরোতেই বহু নারী পাঁচজনেরও বেশি যৌনসঙ্গী বানিয়ে ফেলে। যৌন সংক্রামক রোগীর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির হার আশঙ্কাজনক। ২০১৫ সালের ১৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে-

'২০০৬ সালের পর প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী যৌনবাহিত সংক্রামক রোগ ক্লামিডিয়া, গনোরিয়া ও সিফলিস উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যৌন সংক্রামক রোগগুলো তীব্রভাবে আক্রান্ত করছে তরুণদের, বিশেষত নারীদের। নারীদের সংক্রমণ ২০১৪ সালে এই তিনটি রোগের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে মারাত্মক অবদান রেখেছিল।'

২০১৪ সালের উপাত্ত থেকে এটাও জানা যায়-তরুণদের মধ্যে এখনও যৌন সংক্রামক রোগ বিশেষ করে ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। যৌনসক্রিয় জনসংখ্যার তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র অংশ হওয়া সত্ত্বেও ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণরা ২০১৪ সালে সবচেয়ে বেশি হারে ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। এ ছাড়াও পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো থেকে জানা যায়, প্রতি বছর যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত প্রায় ২০ মিলিয়ন রোগীর অর্ধেকই এসব কলেজপড়ুয়া তরুণ-তরুণী। সিডিসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধমূলক পরিষেবা টাস্ক ফোর্স ২৫ বছরের কম বয়সি যৌনসক্রিয় নারীদের বাৎসরিক রোগ ক্লামিডিয়া ও গনোরিয়া পরীক্ষার জন্য সুপারিশ করলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অসংখ্য তরুণের রোগ পরীক্ষাই করা হয়ে ওঠে না। ফলে তারা জানেও না যে তারা আক্রান্ত।

বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তির কল্যাণে এই তিনটি রোগই নিরাময়যোগ্য। তারপরও সিডিসি কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌন সংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান হার নিয়ে উদবিগ্ন? কারণ তারা জানে, যত বেশিসংখ্যক মানুষ যৌন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে, তত বেশি এইচআইভি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। সিডিসির বার্তা খুবই সুস্পষ্ট। একজন ব্যক্তির যত বেশি যৌনসঙ্গী থাকবে, তার যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ভুলে যাবেন না, সিডিসি ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই বলেছে-এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে নারীরা। কেন তারা বেশি অনিরাপদ?

২০০৮ সালের ৯ ডিসেম্বর পল সিমস ডেইলি মেইল-এ প্রকাশিত তার In the Age of Promiscuity, Women Have More Sexual Partners Than Men শীর্ষক কলামে সেই প্রশ্নের জবাব দেন। More Magazine-এর একটি গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন- 'গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী, নারীরা দিনদিন অধিক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। পুরুষদের চেয়ে তাদের যৌনসঙ্গী অনেক বেশি।'

২১ বছর বয়সের মধ্যে তারা গড়ে ৯ জন প্রেমিকের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়। এবং এক-চতুর্থাংশ নারী কুমারীত্ব হারানোর পর থেকে পাঁচ বছরে এক-পঞ্চমাংশ তরুণের তুলনায় ১০ জনেরও বেশি সঙ্গীর সাথে সংগম করে। এ ছাড়াও তরুণীদের বিশ্বাসঘাতক আচরণ করার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ। এর মধ্যে সঙ্গীর সাথে প্রতারণার কথা স্বীকার করে ৫০ শতাংশ। গবেষণাটি আরও খুঁজে পায়-অর্ধেক নারীই যাদের কাছে কুমারীত্ব হারিয়েছিল, তাদের প্রতি প্রেমের কোনো অনুভূতি ছিল না। প্রতি ১০ জনের মধ্যে সাতজনের ক্ষেত্রেই এটা ছিল নিছক ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড। প্রতি চারজনে একজন টাকার জন্য এবং ৩৯ শতাংশ নারী শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছিল পদোন্নতির জন্য।

এ ছাড়া ২৭ শতাংশ নারী বিবাহিত পুরুষের সাথে এবং ১৪ শতাংশ নারী তাদের বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্কে জড়ানোর কথা বলে। সুস্পষ্টভাবেই নারীবাদীদের অবাধ যৌনাচার আন্দোলন এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। এখানেই এর শেষ নয়। মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাব অনস্বীকার্য। ডক্টর সুসান ক্রাউস হুইটবার্ন সাইকোলজি টুডে-তে প্রকাশিত তার দুটি কলামে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রথম কলামটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালের ৯ মার্চ, How Casual Sex Can Affect Our Mental Health শিরোনামে। তার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী-

'উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্কের বিস্তৃত এক গবেষণার পর কিনসে ইনস্টিটিউটের গবেষক জাস্টিন গার্সিয়া এবং তার দল সিদ্ধান্তে আসেন-অবাধ যৌন সম্পর্ক (Hookups) একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পালাবদলের অংশ, যা পশ্চিমা বিশ্বে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে। অবাধ যৌন সম্পর্ক মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব ফেলে। যেসব ব্যক্তি উদ্দেশ্যহীন শারীরিক সম্পর্কে জড়িত হয়, তাদের প্রত্যেককেই এর মানসিক পরিণাম ভোগ করতে হয়। এর প্রভাব শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের দীর্ঘদিন পরেও রয়ে যায়। যেসব গবেষক মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে অবাধ যৌনাচারের সংযোগের নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তারা আরও রিপোর্ট করেন- যেসব ব্যক্তি পূর্বে হতাশ ছিল না, উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পর তাদের মধ্যে অনেক বেশি হতাশার লক্ষণ এবং একাকিত্ব লক্ষ করা যায়। যারা যত বেশি অবাধ যৌনাচারে জড়িত, তাদের মানসিক যন্ত্রণা তত বেশি।'

সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাদকাসক্তি কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ড্রাগ ও অ্যালকোহল পুনর্বাসনকেন্দ্র তাদের alcoholrehab.com ওয়েবসাইটে খোলাখুলিভাবে এর উত্তর দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে- 'অ্যালকোহল ও ড্রাগ অপব্যবহারের ফলে অনেক সমস্যার সূত্রপাত হয়। এসব অপব্যবহারের অন্যতম আসন্ন বিপর্যয় ঘটবে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে। মানুষের পক্ষে মন পরিবর্তনকারী পদার্থের অপব্যবহার করে অটুট সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তি

বেশি মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে এটা সম্পূর্ণভাবে তার জীবন দখল করবে এবং তার জীবনে আর অন্য কারও জন্য জায়গা থাকবে না। কারণ, মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিভ্রম ও আচ্ছন্নতায় ডুবে থাকে। তারা যতদিন পর্যন্ত মাদক পরিহার না করবে, ততদিন এর কোনো পরিবর্তন অসম্ভব। এমনকি এখান থেকে আরোগ্যলাভের পরেও অন্তরঙ্গ এবং স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক উপভোগ করার সক্ষমতা ফিরে পেতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।'

এ বিষয়টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বেথ ওয়াটসন ২০১৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে 'উচ্ছৃঙ্খলতা কি আত্মহননের ভিন্ন রূপ?' নামে একটি ব্লগ পোস্ট লিখতে শুরু করেন। তার মতে, পিতৃহীন কন্যাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা এখন আত্মহননরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অন্য বিশেষজ্ঞদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন-'যে কন্যারা পিতৃহীনভাবে বেড়ে ওঠে, তাদের পক্ষে যৌন আচরণ এবং সমস্ত অসৎ জায়গায় বৈধতা খোঁজা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

পিতৃহীন কন্যাদের মধ্যে প্রায়ই সাধারণ চর্চা হিসেবে উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয় এবং এর সম্ভাব্য কারণ পিতার অভাব। ক্যাপিট্যাল প্রিপারেটরি ম্যাগনেট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর স্টিভ পেরিও পিতৃহীন কন্যাদের নিয়ে কাজ করার সময় একই বিষয় লক্ষ করেছেন। বলেছেন-'উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রধান বিষয়। প্রায়শই আমরা যখন মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত তরুণীদের দিকে লক্ষ করি, তাদের স্ববিকৃতিকে বিদ্রুপপূর্ণ হিসেবেই চিন্তা করি। এটা সত্যিই বিদ্রূপপূর্ণ বটে, তবে স্ববিকৃতির আরেকটি অর্থ হলো-অন্য কাউকে আপনার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া।'

নারীবাদীরা তাদের লাগামহীন মিথ্যাচার প্রচারের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইছে-বিশৃঙ্খলতার অর্থ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা। অবাধ যৌনাচার আন্দোলনকে ব্যবহার করে তারা ইতোমধ্যে বিবাহপ্রথা এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে একটি বিশৃঙ্খল সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটিয়েছে, যেটা সিডিসির মতে-যৌনব্যাধি সৃষ্টি এবং আশঙ্কাজনক হারে তা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

উদ্দেশ্যহীন যৌন সম্পর্কের সপক্ষে ফেমিনিস্টদের দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্পেইন নারীদের ক্ষতিকর জন্মনিরোধক পিল সেবনে প্ররোচিত করছে, তৈরি করছে ক্রমবর্ধমান মানসিক সমস্যা। উপরন্তু গবেষকগণ বলছেন-একজন ব্যক্তির যত বেশি যৌনসঙ্গী রয়েছে, তার মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। সর্বোপরি জন্মনিরোধক এবং গর্ভপাত অবলম্বনের মাধ্যমে সৃষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা সন্দেহাতীতভাবে নারীদের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। যদিও ফেমিনিস্টরা এসব সংকটের পেছনে নিজেদের দায় অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের সেসব মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য নারীবাদীদের সংগঠিত ও অর্থায়িত Slut Walks-এর কার্যক্রমের দিকে

লক্ষ রাখাই যথেষ্ট। নারীবাদীরা যতই মিথ্যা বলুক না কেন, বাস্তবতা হলো-উচ্ছৃঙ্খলতার সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি রয়েছে।

_________★★★________

পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে তিনটি মিথ

একটি দম্পতি লন্ডনের একটি পার্কের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয় যে তর্কের এক পর্যায়ে স্বামী অনেক রেগে যান। ফলে তিনি তাঁর স্ত্রীর ওপর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত সব পথচারীরা সেখানে হস্তক্ষেপ করে, কঠোরভাবে লোকটিকে শাসিয়ে দেয়। তারা পুলিশকে জানানোর হুমকিও দেয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখানো হয়, আগের বারের মতোই এবারও তর্ক শুরু হলো। কিন্তু এবার রেগে যান স্ত্রী। তিনি স্বামীকে গালি দেওয়া শুরু করেন, মাথা চেপে ধরে ল্যাম্পপোস্টের সাথে ধাক্কা দেন। মজার ব্যাপার হলো, এবার কোনো পথচারীকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। অনেকেই হাসছিল। যদিও স্বামী-স্ত্রীর পুরো ঘটনাই অভিনয় ছিল, কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষের মানসিকতা বুঝতে পারি।

ভিডিওটি পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপারে সমাজের বিভ্রান্ত ও ভয়ংকর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে। সবাই স্বীকার করে নিয়েছে, নারীরা যখন সহিংসতার শিকার হয় তখন তাদেরকে আমাদের অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। কিন্তু যখন সেই একই নির্যাতনের শিকার হবে একজন পুরুষ, তখন সবার মনে হয়, 'পুরুষ! তারা কীভাবে নির্যাতনের শিকার হতে পারে!'

নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ন্যায়বিচার। স্বামী-স্ত্রীর কখনোই একে অপরের দ্বারা অবনমিত, অপদস্ত হওয়া উচিত নয়। এখানে লিঙ্গ জরুরি বিষয় না। বলার অপেক্ষা রাখে না, পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া যে কারও জন্যই কষ্টের, হতাশার। এমনকি পুরুষের ক্ষেত্রেও। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে যারাই কাজ করছেন, এ সামাজিক অসুস্থতা প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন সবাইকে বুঝতে হবে, এটি কোনো লিঙ্গভিত্তিক সমস্যা নয়। কাজেই এ সমস্যা সমাধানের জন্যও নারীবাদের মতো কোনো লিঙ্গভিত্তিক সমাধানের প্রয়োজন নেই। এখানে বেশ জনপ্রিয় কয়েকটি মিথের উল্লেখ করা হলো।

মিথ ১: কেবল নারীরাই পুরুষ কর্তৃক পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়

নারীবাদী এবং নারীর অধিকার রক্ষায় কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমাগত প্রোপাগান্ডা, একপেশে প্রচারণার কারণে আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্ম দিয়েছে যে, পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয় কেবলমাত্র নারীরা। আর কেউ হবে না, হওয়া সম্ভব না।

বাস্তবতা: ২০১২ সালে বিবাহিত নারীর তুলনায় বিবাহিত পুরুষেরা দাম্পত্য জীবনে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। (Source: British Crime Survey)'

পারিবারিক সহিংসতার শিকার মানুষদের মধ্যে ৪০%ই পুরুষ। (Source: Office for National Statistics)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, একপেশে সহিংস সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে ৭০% এরও বেশি ক্ষেত্রে নারীরাই দায়ী। (Source: American Journal of Public Health)

নারীরা প্রায় পুরুষের সমান জুলুমই করছে, কখনো কখনো বেশিও করছে। কিন্তু এ সত্যটি যদি আপনি সামনে নিয়ে আসেন, তাহলে বিস্ফোরণ হবে। সমাজের একটি বিরাট অংশ বিষয়টি মেনে নিতে পারবেন না। নারীবাদীদের অনেকেও বিষয়টি কোনোভাবেই মানতে পারে না। অথচ কেউ বলছে না যে পুরুষের ওপর নির্যাতনের কারণে নারীর ওপর নির্যাতন বৈধ হয়ে যায়। দুটোই সমান বর্জনীয়।

সাধারণ দম্পতিদের কথা বাদই দিই। আমরা যদি শুধু সমকামী দম্পতিদের দিকে তাকাই তাহলেও এক অদ্ভুত বাস্তবতার সম্মুখীন হব। পুরুষ সমকামীদের তুলনায় নারী সমকামীরা বেশি পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়!

রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের (সিডিসি) [৪০] অনুসন্ধান অনুসারে, ৪৪% নারী সমকামীরা তাদের জীবনসঙ্গী কর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অর্থাৎ ২৯%ই নারী সহযোগী দ্বারা হয়ে থাকে। যেখানে ৩৫% সাধারণ নারী (Straight, সমকামী নন এমন), ২৯% পুরুষ নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। পুরুষ সমকামীদের মধ্যে এ হার হলো ২৬%।

নারীবাদী এবং এ মিথের সমর্থকরা সবসময়ই তাদের কথা, প্রোপাগান্ডায় বোঝানোর চেষ্টা করে, পুরুষরা মজ্জাগতভাবেই আগ্রাসী এবং নারীরা অসহায়, পুরুষরা সবসময়ই আক্রমণাত্মক এবং নারীরা সবসময়ই নির্যাতিত। এ পক্ষপাতদুষ্ট প্রোপাগান্ডার কারণে নারীর পক্ষে যেকোনো সহানুভূতি, লাইসেন্স ও প্রতিরক্ষা বৈধ হয়ে যায় এবং পুরুষের ক্ষেত্রে থাকে জিরো টলারেন্স।

মিথ ২: নারীরা পুরুষদের ক্ষতি করতে পারে না

ভিডিওটির পুরুষটিকে এমন পরিস্থিতিতে দেখেও পথচারীরা কেন হাসছিল? কেউ কেউ দাবি করছেন যে পুরুষরা যেহেতু নারীদের চেয়ে শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী, তাই একজন নারী চাইলেই একজন পুরুষকে আঘাত করতে পারে না। আর যদি কেউ করেও সে ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ভালোভাবেই তা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।

বাস্তবতা: নারীরা চাইলে পুরুষদের মতোই ক্ষতি করতে পারে। নারীর তুলনায় পুরুষের বেশি শারীরিক শক্তি থাকলেও নারী আততায়ীরা পুরুষদের শারীরিক ক্ষতি করতে (বিশেষ করে

কোনো বস্তু ব্যবহার করে) পুরোপুরি সক্ষম। এ ছাড়াও ক্ষতিসাধনের পর তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য অনেক বেশি মনস্তাত্ত্বিক এবং আইনি শক্তি নারীদের রয়েছে।

নামক The Mankind Initiative-এর প্রকাশিত রিপোর্টে পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'পুরুষদের লোহার বার বিছিয়ে শোয়ানো হয়, তাদের খাবারে কাচ রেখে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে ছুরিকাঘাত করা হয়। অনেকের মুখে ঘুষি মেরে জখম করা হয় এবং কুড়াল দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়।' Parity* আরেকটি সংস্থা পুরুষ ভুক্তভোগীদের একটি নমুনা প্রকাশ করেছে। তাদের অনুসন্ধান অনুসারে, প্রায় অর্ধেক ভুক্তভোগীকে অস্ত্র দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পুরুষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। এক-তৃতীয়াংশকে যৌনাঙ্গে লাথি মেরে আহত করা হয়েছে। বাকিদেরকে ছুরিকাঘাতে, পুড়িয়ে, ভারী বস্তু দিয়ে আঘাতের মাধ্যমে গুরুতর জখম করা হয়েছে। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে নারীরা পুরুষদের নির্যাতন করতে পারে। শুধু তাই নয়, পুরুষরা তাদের নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি রিপোর্ট করে না বললেই চলে। যারা করে, তাদের সবাইকে বৈষম্য এবং পক্ষপাতিত্বের স্বীকার হতে হয়। প্রশাসন তাদেরকে পাত্তা দেয় না, আদালত একচেটিয়া রায় দেয়। পুরুষ গুরুতরভাবে জখম হওয়ার আগ পর্যন্ত পুলিশ নারী হামলাকারীর বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করে না।

Parity আরও বলেছে, 'জিরো টলারেন্স নীতি এবং গ্রেফতারের নীতিগুলো শুধু পুরুষের ক্ষেত্রেই। পুরুষ ভিক্টিম এবং তাদের সন্তানদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে তেমন কেউই এগিয়ে আসে না।... এমনকি জরুরি ভিত্তিতে একজন নারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে একজন পুরুষকে দ্বিগুণ ঘাম ঝরাতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই পুলিশ তাদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করে এবং ব্যাপক হয়রানি করে।' শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ পুরুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় পুলিশ বরং সেসব অভিযোগকারী পুরুষদের গ্রেফতার করেছে। অর্থাৎ, নারীরা যে পুরুষদের শুধু নির্যাতন করতে পারে তাই না, পুলিশের সামনে তারা সেই ভুক্তভোগী পুরুষকেই অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারে। শুধু সে পুরুষ বলে!

_________★★★_________

মিথ ৩: লিঙ্গ-সমতা নারী-পুরুষের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করবে

নারীবাদের মতো আন্দোলনগুলো যে 'লিঙ্গ-সমতা'-কে সমর্থন করে, সে সমতায় পুরুষকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নারী যত বেশি পুরুষের মতো হতে পারবে ততই যেন সফল হতে পারবে। তারা নারী-পুরুষ উভয়কে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে নিয়ে আসতে চায়।

বাস্তবতা: নারীবাদের উত্থান এবং নারীর পুরুষের 'সমান' হয়ে ওঠার প্রবণতার কারণে দেখা যাচ্ছে নারীরা ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠেছে। The Independent এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, নারী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ গত ৫ বছরের ব্যবধানে ১২% বেড়েছে। যা পুরুষের তুলনায় ৪ গুণ বেশি। ১৯৭৩ সালের পর থেকে নারী কর্তৃক সংঘটিত সহিংসতা, ডাকাতি, হত্যা ও মাদকসংক্রান্ত অপরাধ ২৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালে সরকারি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গৃহকর্মী নির্যাতনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া নারীদের সংখ্যা ছয় বছরে বেড়েছে চার গুণ। অর্থাৎ ২০০4- ২০০5 সালে ছিল ৮০৬ জন যা ২০০৯-২০১০ বেড়ে হয় ৩৪৯৪ জন।

নারীবাদীরা যদিও পুরুষের মতো সুবিধা, অধিকার পাওয়াকে নিজেদের সফলতার মানদণ্ড হিসেবে দেখেছে, কিন্তু তারা দায়িত্বে সমান অংশীদার হতে রাজি নয়। যদি ধরেও নিই, প্রচলিত সমাজে নারীরা অপমানিত, পুরুষরা সম্মানিত, আলোকিত; তাহলে তো নারীর পুরুষের সমান সম্মান অর্জন করার জন্য পুরুষের মতোই কাজ করা উচিত। নারীরা যখন সর্বাত্মকভাবে কেবল পুরুষের সমান অধিকারই ভোগ করতে চায় এবং সকলপ্রকার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, দেখা যায় তারা সেই একই জুলুম পুরুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে যার জন্য তারা পুরুষকে দোষারোপ করত। বিষয়টি পুরোই নিজের স্বার্থে ক্ষমতা প্রয়োগ।

ইসলামে অবশ্যই একজন নারীর অধিকারের কথা রয়েছে। পাশাপাশি নারীকে কিছু দায়িত্ব পালনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তাঁর দায়িত্ব হলো তাঁর স্বামীর হক ও সম্পদ রক্ষা করা এবং সন্তানদের সঠিকভাবে লালনপালন করা, দ্বীনের ওপর বড় করে তোলা। অন্যদিকে স্বামী হবেন পরিবারের প্রধান। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের কাজ, আচরণ ও মৌলিক চাহিদার জন্য আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু বর্তমান মুসলিম পরিবারগুলোতে স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না। তারা নিজেদের অধিকারে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দিতে রাজি না। এসব পরিবারে পারিবারিক সহিংসতার মতো ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু না।

পশ্চিমা-সমাজে নারী-পুরুষের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শিক অবস্থান, নৈতিকতা কিংবা মূল্যবোধ নেই। তারা জানে না তারা কেন বাঁচে, কী করা উচিত। কাজেই, সেখানে নারী-পুরুষদের মধ্যে হতাশা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। নারীরা পুরুষের 'সমান' হবার চেষ্টায় কয়েক

শতাব্দী ব্যয় করে ফেলেছে, অথচ তারা একবারও জিজ্ঞেস করার সময় পায়নি, যেসকল কারণে তারা পুরুষদের সেরা মনে করছে সেগুলো আসলেই সফলতা বা শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড কিনা। 'লিঙ্গ-সমতা' কোনোভাবেই নারী-পুরুষের মধ্যকার সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। বরং নারী-পুরুষের মধ্যকার ভালোবাসা, আশা, দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা, পারস্পরিক মানসিক বোঝাপড়াই পারে সুস্থ পরিবার, সমাজ ও সভ্যতা তৈরি করতে। আমাদের আচরণের ভিত্তি হওয়া উচিত ন্যায়বিচার; নিজেদের খেয়ালখুশি নয়। শুধু ইসলামই পারে নারী-পুরুষের যোগ্যতা অনুসারে শ্রমবণ্টন করে উভয়ের অধিকার নিশ্চিত করতে।

_________★★★________

পারিবারিক সহিংসতার মিথ্যাচার

পারিবারিক সহিংসতার মিথ্যাচার হলো এই সম্পর্কিত ভুল ধারণা, যা শিকারদের সাহায্য চাইতে বাধা দেয়। কিছু সাধারণ মিথ্যাচার হলো: এটি শুধুমাত্র শারীরিক নির্যাতন, এটি একটি ব্যক্তিগত সমস্যা, এবং এটি শুধুমাত্র মহিলাদের ক্ষেত্রেই ঘটে। আসলে, পারিবারিক সহিংসতা শারীরিক, মানসিক, যৌন, বা আর্থিক নির্যাতন হতে পারে এবং এটি কেবল নারীদের নয়, শিশুদেরও প্রভাবিত করে। এই মিথ্যাচার দূর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে শিকাররা সঠিক সময়ে সাহায্য চাইতে পারে।

পারিবারিক সহিংসতার সাধারণ মিথ্যাচার:

- **মিথ্যাচার: এটি শুধুমাত্র শারীরিক নির্যাতন।**
  - **সত্য:** শারীরিক নির্যাতন ছাড়াও মানসিক, যৌন এবং আর্থিক নির্যাতন এর অন্তর্ভুক্ত।
- **মিথ্যাচার: এটি শুধুমাত্র মহিলাদের উপর ঘটে।**
  - **সত্য:** যদিও মহিলারা প্রায়শই শিকার হন, এটি পুরুষ এবং শিশুসহ পরিবারের যে কোনো সদস্যের উপর ঘটতে পারে।
- **মিথ্যাচার: এটি একটি ব্যক্তিগত সমস্যা যা ঘরোয়াভাবে সমাধান করা উচিত।**
  - **সত্য:** এটি একটি সামাজিক সমস্যা এবং আইনি প্রতিকার ও সহায়তার প্রয়োজন।
- **মিথ্যাচার: ভুক্তভোগী নিজেই এর জন্য দায়ী।**
  - **সত্য:** কোনো পরিস্থিতিতেই নির্যাতনকে সমর্থন করা যায় না এবং নির্যাতনকারীই সম্পূর্ণভাবে দায়ী।
- **মিথ্যাচার: এটি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ধরণের সম্পর্কের মধ্যেই ঘটে।**
  - **সত্য:** এটি স্বামী-স্ত্রী, সঙ্গী, বা পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে ঘটতে পারে এবং এটি "ঘরোয়া সম্পর্ক" হিসেবে বিবেচিত হয়।

২০০৭ সালের মে মাসে জনস্বাস্থ্যবিষয়ক একটি আমেরিকান পিয়ার রিভিউড জার্নাল "Differences in Frequency of Violence and Reported Injury Between Relationships with Reciprocal and Nonreciprocal Intimate Partner Violence' নামক একটি গবেষণা প্রকাশ করে। শুরুতেই লেখকরা সেখানে এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো সম্পর্কে বলেন- 'অনেকগুলো গবেষণা অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়, নারী ও পুরুষরা তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ওপর অত্যাচার শুরু করে এবং তাদের উভয়ের অত্যাচারের হার প্রায় একই রকম।' National Longitudinal Study of Adolescent Health-এর ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়সি প্রায় ১১ জন অংশগ্রহণকারীর নমুনা থেকে তাদের গবেষণার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার একটি তথ্য হলো-'সহিংসতাপূর্ণ সম্পর্কের প্রায় ৪৯.৭%

ক্ষেত্রে উভয় দিক থেকে হিংস্র আচরণ লক্ষ করা যায়। পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশিসংখ্যক সহিংসতামূলক সম্পর্কের ব্যাপারে পুলিশ রিপোর্ট করেছিলেন, যেখানে একপাক্ষিক ও উভয়পাক্ষিক-দুই ধরনের সহিংসতাই ছিল।' National Violence Against Women Survey-এর অনুসন্ধানকৃত তথ্যানুযায়ী, যে নারীরা সমকামী সঙ্গীর সাথে বসবাস করেন, তাদের ৩৫.৪ শতাংশ জীবদ্দশায় সঙ্গিনীর দ্বারা সহিংস আচরণের মুখোমুখি হন। অন্যদিকে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গীর সাথে বসবাসকারী নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ২০.৪%। অর্থাৎ, ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট নারীদের চেয়ে সমকামী নারীরা ৭৫% বেশি পারিবারিক সহিংসতার শিকার। এ ছাড়াও সমকামী নারীদের অপেক্ষাকৃত বেশি নিপীড়নের বিষয়টি নিশ্চিত করে ২০১০ ও ২০১৩ সালে পৃথক পৃথক দুটি প্রতিবেদন পেশ করে CDC National Intimate Partner and Sexual Violence Survey। এখানে একটি নীতি পরিষ্কার-সম্পর্কে জড়িত থাকাকালীন নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি সহিংস হয়ে থাকে।

১৯৮৩ সালে হ্যামলিন ল রিভিউ বিখ্যাত নারীবাদী এলেন পেন্সের একটি কলাম প্রকাশ করে। 'The Duluth Domestic Abuse Intervention Project' নামের সেই কলামে পুরুষদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ আর জিঘাংসা ছড়িয়ে দেন পেন্স। এর আগে পারিবারিক সহিংসতা মোকাবিলায় একটি প্রোগ্রাম চালাতে বেশ মোটা অঙ্কের অর্থ অনুদান পেয়েছিলেন তিনি। তার অভিমত ছিল- পারিবারিক সহিংসতার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোককে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। সে সময় আরও অনেক ফেমিনিস্ট তার এই অভিমত সমর্থন করে। যেকোনো অভিযুক্ত পুরুষমাত্রই দোষী-মোটাদাগে এটাই ছিল পেন্সের দৃষ্টিভঙ্গি।

১৯৮০ সালে সেই উদ্দেশ্যেই 'Domestic Violence Intervention Project' (DAIP) গঠন করা হয়। সংস্থাটির প্রথম কাজ ছিল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আইনজীবী এবং আদালতে পারিবারিক সহিংসতার ধারণা সুবিধামতো বদলে দেওয়া ফেমিনিস্টদের লিঙ্গবৈষম্যমূলক তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য পারিবারিক সহিংসতাকে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতেন।

১৯৮২ সালে পেন্সের মতাদর্শ মোতাবেক মিনেসোটার গ্রেফতার আইন বদলে দেওয়া হয়। পেন্সের মতে- 'অন্যান্য অপরাধের বিপরীতে একজন পুলিশ অফিসার প্রকৃতপক্ষে অপরাধমূলক আচরণ পর্যবেক্ষণ না করেই অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারবেন। আইন অফিসারকে সম্ভাব্য কারণ দেখিয়ে গ্রেফতারের সেই ক্ষমতা প্রদান করেছে। পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে যদি নির্যাতিত ব্যক্তির গায়ে বাহ্যিক ক্ষত কিংবা শারীরিক বিকলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায়, তাহলে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই লিভ টুগেদারে থাকা যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাবে এবং সেটা করতে হবে অনূর্ধ্ব চার ঘণ্টার মধ্যে।'

অ্যাডাম লিপতাক ২০০৮ সালে নিউইয়র্ক টাইমসে ভার্জিনিয়ার একজন আইনজীবী লেসলি পি স্মিথকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, যিনি অন্য আইনজীবীদের অন্যায়ভাবে সাক্ষী পরিবর্তন এবং সাক্ষীকে নিয়ে কৌশল খাটাতে দেখেছিলেন।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে Christian Science Monitor ফ্লোরিডার ক্রাইম ল্যাবে একটি সাক্ষী বদলের খবর পায়। তারা প্রতিবেদন করে-

'রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একটি ক্রাইম ল্যাবের মাদক মামলায় একজন রসায়নবিদের বিরুদ্ধে সাক্ষী বদলের অভিযোগ বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। Pensacola Regional Crime Lab-এ কর্মরত সেই রসায়নবিদের বিরুদ্ধে অনুমোদিত ড্রাগ সরিয়ে প্যাকেটের ভেতর বিপুল পরিমাণ অননুমোদিত ড্রাগ রাখার অভিযোগ আনা হয়। সাক্ষী বদলের অভিযোগে প্রায় ২৬০০ ড্রাগ মামলায় শত শত মানুষকে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হতে পারে।'ঠিক তার পরের মাসে, ২০১৪ সালের মার্চে আলাস্কার আঙ্কোরেজে KTVA News একটি প্রতিবেদন করে-

'স্টেট ক্রাইম ল্যাব-এর একজন প্রাক্তন কর্মীকে ছয়টি গুরুতর অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ৫৩ বছর বয়সি স্টিফেন পামারকে মাদক চুরি এবং অন্যায়ভাবে সাক্ষী বদলের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।'

পরিশেষে অ্যানি দুখানের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। তিনি ক্রাইম ল্যাবেরই একজন রসায়নবিদ। Pro Publica-এর ২০১৭ সালের ১৯ মার্চের নিউজ স্টোরি অনুসারে- 'তিনি বহুসংখ্যক মানুষকে জেলে পাঠানোর জন্য ড্রাগ পরীক্ষার ভুয়া ফলাফল তৈরি এবং অন্যায়ভাবে সাক্ষী-প্রমাণ বদলের কথা স্বীকার করেন। তার এই জালিয়াতির কারণে ২৪ হাজার মানুষ জেলে যেতে পারত।'

এটাই সত্যি। দুখান ল্যাবের সাক্ষী-প্রমাণ ধ্বংস করেছিলেন, যার কারণে অন্যায়ভাবে জেলে যেতে হতো প্রায় ২৪ হাজার মানুষকে। বিষয়টা নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। একজন পুরুষবিদ্বেষী ফেমিনিস্ট সাক্ষী বদলের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য কতটা ক্ষতিসাধন করতে পারে।

২০০৯ সালে মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন স্কুলের জোনা রেজা 'Beyond Duluth: A Broad Spectrum of Treatment for Broad Spectrum of Domestic Violence' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। নিবন্ধটি মন্টানা আইন পর্যালোচনায় প্রকাশিত হয়েছিল। রেজার গবেষণায় লেখা হয়-'ডুলুথের মডেল মূলত তাদের ব্যক্তিগত কল্পনা। সামাজিক পিতৃতন্ত্রের জুজুর ভয় দেখিয়ে তারা মূলত পুরুষদের দমিয়ে রাখতে চায়। ডুলুথ মডেল পারিবারিক সহিংসতার অন্যান্য কারণ। যেমন: নিপীড়নমূলক সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, আক্রমণাত্মক প্রেক্ষাপট অথবা চলমান তিক্ত সম্পর্ককে চিহ্নিত করে না।'

তিনি আরও বলেন-'সহিংসতার পেছনে আরও ভয়ংকর কারণও থাকে। যেমন : সহিংসতাকারীর ওপর মানসিক চাপ, দম্পতির পরস্পর নেতিবাচক সম্পর্ক। কিন্তু এগুলোকে সহিংসতার কারণ থেকে কৌশলে বাদ দেওয়া হয়েছে। নারীরা কোনো সহিংসতামূলক কাজ করলে সেটা হয়ে যায় অস্তিত্বহীন, আত্মরক্ষামূলক কিংবা অগ্রাহ্য করার মতো তুচ্ছ ব্যাপার।'

মিথ্যাচারগুলো কেন ক্ষতিকর?

- মিথ্যাচার এবং ভুল ধারণার কারণে ভুক্তভোগীরা নিজেদের দোষী মনে করতে পারেন।

- এটি তাদের সাহায্য চাইতে বাধা দেয়, যা তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- এর ফলে অপরাধী পার পেয়ে যায় এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।

এই সমস্যার সমাধান:

- পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ভুক্তভোগীদের জন্য আইনি সহায়তা এবং মানসিক সহায়তার সুযোগ সহজলভ্য করা।
- এই ধরনের আচরণকে উৎসাহিত না করে এবং নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

_________★★★_________

সাহিত্য ও পপ কালচারে নারীবাদ এবং ইসলামবিদ্বেষের ভয়াল রূপ

সাহিত্য ও পপ কালচারে নারীবাদ এবং ইসলামবিদ্বেষকে প্রায়শই একে অপরের পরিপূরক বা প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে নারীবাদকে অনেক সময় পশ্চিমা বা ইসলাম-বহির্ভূত দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়। ইসলামবিদ্বেষী ধারণাগুলো নারীবাদকে কেবল একটি 'পশ্চিমা' বা 'নাস্তিক' মতাদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করে, যা মুসলিম নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকারের পরিপন্থী। অন্যদিকে, কিছু নারীবাদী ধারাও ইসলামের নির্দিষ্ট কিছু ঐতিহ্য ও রীতিকে পুরুষতান্ত্রিক বলে সমালোচনা করে এবং ইসলামবিদ্বেষী ধারণাগুলোকেও সমর্থন করে, যা মুসলিম নারীদের অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করে। এই দুইয়ের ভয়াল রূপ হলো, এটি মুসলিম নারীদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে তারা হয় 'পশ্চিমা' নারীবাদ গ্রহণ করবে, নয়তো তাদের ধর্ম বা সংস্কৃতিকে ত্যাগ করবে, যা তাদের বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

সাহিত্য ও পপ কালচারে এই দুটি ধারণার সমন্বয়:

১. ইসলামবিদ্বেষী ও নারীবাদী নারীবাদ:

- **ইসলামবিদ্বেষী নারীবাদ:** এই ধারাটি নারীবাদকে একটি পশ্চিমা ও নাস্তিক মতাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে, যা ইসলাম ও মুসলিম নারীদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটি ছদ্মবেশী আক্রমণ। এটি মুসলিম নারীদেরকে প্রায়শই "নিপীড়িত" বা "প্রগতিবিরোধী" হিসেবে দেখায়, যা তাদের বাস্তব ও নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে। এই ধারণাটি পপ কালচারে "পশ্চিমা" বা "ইসলাম-বহির্ভূত" নারীবাদকে মুসলিম নারীদের জন্য একমাত্র মুক্তিদায়ক পথ হিসেবে প্রচার করে, যা মুসলিম নারীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, "আফগান নারীর জন্য শ্বেতাঙ্গদের কান্না" বা "পশ্চিমা পুতুল মালালার বিষাক্ত নারীবাদ"-এর মতো কিছু ধারণা এই ধরনের প্রতিনিধিত্বের উদাহরণ।
- **নারীবাদী ইসলামবিদ্বেষী নারীবাদ:** এর বিপরীতে, কিছু নারীবাদী ধারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে পুরুষতান্ত্রিক এবং নারীর জন্য ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত করে। এই ধারাটিও মুসলিম নারীদের অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করে এবং তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ব্যর্থ হয়। এটি মুসলিম নারীদেরকে

এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন তারা শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শিকার, এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে পারে না।

২. সাহিত্য ও পপ কালচারে উপস্থাপনা:

- **"নিপীড়িত" মুসলিম নারী:** সাহিত্য ও পপ কালচারে মুসলিম নারীদের প্রায়শই "নিপীড়িত" বা "অসহায়" হিসেবে দেখানো হয়। তাদের পোশাক, সংস্কৃতি বা ধর্মকে প্রায়শই নারী স্বাধীনতার পথে বাধা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই ধরনের একটি "পশ্চিমা" বা "পুরুষতান্ত্রিক" নারীবাদ মুসলিম নারীদের নিজস্ব শক্তি, ক্ষমতা এবং অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে।
- **"সাহায্যকারী" পশ্চিমা নারীবাদ:** পপ কালচারে প্রায়শই "পশ্চিমা" বা "ইসলাম-বহির্ভূত" নারীবাদকে মুসলিম নারীদের "মুক্তিদাতা" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই ধরনের একটি "পশ্চিমা" বা "ইসলাম-বহির্ভূত" নারীবাদ মুসলিম নারীদের নিজেদের ধর্ম বা সংস্কৃতি থেকে দূরে সরাতে এবং তাদের নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

৩. উভয় ধারণার ভয়াল রূপ:

- **মুসলিম নারীদের অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা:** এই দুটি ধারার ভয়াল রূপ হল এটি মুসলিম নারীদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করে এবং তাদের নিজস্ব ক্ষমতা ও অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। এই দুটি ধারণা মুসলিম নারীদেরকে "নিপীড়িত" বা "অসহায়" হিসেবে উপস্থাপন করে, যা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে।
- **পপ কালচারের ভুল উপস্থাপনা:** সাহিত্য ও পপ কালচারে এই দুটি ধারণার সমন্বয় মুসলিম নারীদের প্রতি ভুল এবং পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা তৈরি করে, যা মুসলিম নারীদের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে। এটি মুসলিম নারীদের প্রতি ভুল এবং পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা তৈরি করে।

ইসলাম ও হলিউড নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা ~ভুলে গেলে চলবে না, একটি উড়ন্ত কার্পেটে একটি বানর ও একটি ছোট ছেলে, সাথে জাদুর বাতি-এ কার্টুনের মাধ্যমে ইসলামি বিশ্বে হলিউড জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গিয়েছিল। ৯০-এর দশকে নির্মিত 'আলাদিন' হলো কলোনিয়ালিস্টদের চোখে মুসলিমদের চিত্রায়ণ। ** একই পন্থায় আজও নিউকন এবং জায়োনিস্টরা কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামের মূল্যবোধকে লক্ষ্য করে এমন ঘৃণার তির কেবল ডিজনির কার্টুনই ছোড়ে না। ২০০৯ সালে ডিজনি মার্ভেলের স্বত্বাধিকার ক্রয় করে নেয়। দশ বছর পর দেখুন, বহুল প্রশংসিত ব্ল্যাক প্যানথার (Black Panther) মুভি সেই পুরোনো আফ্রিকান মুসলিম স্টেরিওটাইপগুলোকে। আবার উগলে দিচ্ছে। সেখানে বোকো হারাম ধরনের একটি দল 'ওয়াল্লাহি, ওয়াল্লাহি' বলে নারীদেরকে জোর করে হিজাব পরিয়ে কিডন্যাপ করেছে। পরবর্তী

সময়ে মুক্ত হওয়ার পরে তারা নিকাব, হিজাব খুলে ফেলে ইউরোপীয় কলোনিয়াল প্রভুদের শিখিয়ে দেওয়া স্বাধীন হয়ে যায়। আজকালকার মুভিগুলোতে হিজাব খুলে ছুড়ে ফেলা স্বাধীনতার সিম্বোলিজম।

এই ভয়াল রূপ থেকে মুক্তি পেতে, সাহিত্য ও পপ কালচারে মুসলিম নারীদেরকে আরও বাস্তবসম্মত এবং বাস্তবসম্মত উপায়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। তাদের নিজস্ব শক্তি, ক্ষমতা এবং অধিকারকে তুলে ধরা উচিত এবং তাদের নিজস্ব ধর্ম বা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো উচিত।

_________★★★_________

মুসলিম নারীবাদ: উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন

সাধারণ মুসলিমরা নারীবাদ বলতে পশ্চিমা নারীবাদকেই বোঝে। কিন্তু মুসলিম নারীবাদীদের দাবি হলো, তাদের নারীবাদ ও পশ্চিমা নারীবাদ একই নয়। ১৯ তাদের মতে, পশ্চিমা নারীবাদ তারা কখনোই গ্রহণ করবে না। তারা পশ্চিম থেকে শুধু 'নারীবাদ' শব্দটাই ধার করেছে। নিজেদের নতুন আন্দোলনের সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে এ মতাদর্শের নাম দিয়েছে 'মুসলিম নারীবাদ'। তারা অত্যন্ত জোরালো স্বরে বলে, শুধু 'নারীবাদ' শব্দটি গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে তারা পশ্চিমা নারীবাদের সকল মূল্যবোধকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা মনে করে, নারীবাদের সমালোচকদের কোনোভাবেই সব নারীবাদকে এক পাল্লায় মাপা উচিত নয়।

মুসলিম নারীবাদীদের দাবি, যদিও-বা নারীবাদের উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিমে, কিন্তু এর মূল মূল্যবোধ পৃথিবীজুড়ে সব মূলধারার জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তারা মোটেই Femen en[১০] আন্দোলনের মতো নন। অনেক প্রগতিশীল গবেষক এবং কর্মীরা নিয়মিত এর পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন, বই-লিফলেটের মাধ্যমে আদর্শ প্রচার করছেন। মুসলিম নারীবাদীরা বিশ্বাস করে, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন মূল্যবোধগুলোই শুধু তারা গ্রহণ করেছে। কাজেই মুসলিমদের তাদের কাজের বিরোধীতা করার কোনো কারণ নেই।

বিষয়টি আসলেই অবাক করা। মুসলিমদের মধ্য থেকেই একটি জনগোষ্ঠী পশ্চিমের আদর্শ দিব্যি গ্রহণ ও প্রচার করে যাচ্ছে। মুসলিমরা বুঝতে পারে না, ঠিক কী কারণে তারা পশ্চিমা টার্ম, তাদের ওয়ার্ল্ডভিউ, বুদ্ধিবৃত্তি, আইকন, সেকুলার চিন্তা গ্রহণ করছে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে ইসলামের ওপর আরোপ করছে। ইসলামের নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করছে। ইসলাম কি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান নয়। তাহলে আমাদেরকে ঠিক কোন কারণে পশ্চিমা নারীবাদীদের টার্ম এবং মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে হবে? ইসলামে কি এসবের সমাধান নেই?

মজার বিষয় হলো, যখনই মুসলিমরা এসব বিষয়ে মুসলিম নারীবাদীদেরকে প্রশ্ন করে, তারা তখন প্রচণ্ড রেগে যায়। এসবের জবাব দিতে গিয়ে তারা সবসময় ভিক্টিম কার্ড খেলে। নিজেদেরকে ভিক্টিম দেখিয়ে তারা বলেন, 'আপনি কেন মুসলিম নারীদের অধিকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন? নিজেদের অধিকার হওয়া সচেতন হওয়া কি অন্যায়?' এগুলো হাস্যকর, অর্থহীন জবাব। এটি প্রশ্ন ও সমালোচনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটি আবেগপ্রবণ আবেদন তৈরি করা ছাড়া আর কিছুই না। তাদের যুক্তি অনুসারে, আপনি কম্যিউনিজমের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবেন না। কম্যিউনিজমের বিরুদ্ধে কথা বলার মানে হলো দরিদ্র শ্রমিক জনসাধারণের বিরুদ্ধে কথা বলা!

নারীর অধিকারে বিশ্বাস করা আর নারীবাদী হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়। আমি যিশুকে খ্রিষ্ট, নবী হিসাবে বিশ্বাস করি (গ্রীক ভাষায় মিসায়াহ)। আমি কি খ্রিষ্টান হয়ে গেলাম? আমি মনে করি যে দারিদ্রদ্র্য মানুষের জন্য অভিশাপ, দেশকে দ্রুত দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা জরুরি। এর মানে কি আমি একজন কম্যিউনিস্ট? আমি চাই জায়নবাদ ধ্বংস হোক। তাঁর মানে কি আমি অ্যান্টি-সেমিটিক? আসুন একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করি। নারীবাদীরা কি বিশ্বাস করে যে পুরুষদেরও সমান অধিকার থাকা উচিত? জবাব যদি 'হ্যাঁ' হয় তবে কি তাদেরকে 'পুরুষবাদী' বলাযাবে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হলো 'না'।

যে কেউ কোনো লেভেল ছাড়াই দরিদ্র, অসহায়, ফিলিস্তিনি কিংবা অসহায় নারীর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে পারে, তাদের পক্ষে জনমত তৈরি করতে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এ কাজ করার জন্য তাকে নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শের অনুসারী হতে হয় না। প্রতিটি মূল্যবোধ আসে কোনো না কোনো আদর্শিক ভিত্তি থেকে। যদি আমি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কথা বলি এবং এর প্রতিষেধক হিসেবে বলি যে সবার সমান পরিমাণ সম্পদ থাকা উচিত, ব্যক্তিগত মালিকানা ভুল, তাহলে আমি একজন কম্যিউনিস্ট। তেমনইভাবে যদি আমি ইহুদিদেরকে ঘৃণা করার কারণে, ইহুদি-মাত্রই হত্যাযোগ্য মনে করার কারণে জায়নিজমকে উচ্ছেদ করতে চাই, তাহলে আমি একজন অ্যান্টি-সেমেটিক।

মুসলিম নারীবাদ এবং উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন সম্পর্কিত আলোচনাটি জটিল। উপনিবেশবাদের সময়কালে পশ্চিমা নারীবাদী ধারণা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে, যা ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক মূল্যবোধ এবং নতুন অধিকারের ধারণার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি করে। এই পরিস্থিতিতে, কিছু মুসলিম নারীবাদী উপনিবেশবাদকে একটি "উপনিবেশবাদী এজেন্ডা" হিসেবে দেখেন যা পশ্চিমা চিন্তাধারা চাপিয়ে দিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, আবার কেউ কেউ মুসলিম নারীবাদকে ইসলামের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করেন।

উপনিবেশবাদ এবং মুসলিম নারীবাদ: একটি জটিল সম্পর্ক

- **ঔপনিবেশিকতা ও নারীবাদ:** উপনিবেশবাদীরা যখন মুসলিম ভূমিগুলিতে তাদের আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা চালায়, তখন তা স্থানীয় রীতিনীতি এবং ইসলামিক বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে। এই সময়কালে, পশ্চিমা উদারনৈতিক নারীবাদী চিন্তাধারা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে, যা ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক মূল্যবোধের সাথে নতুন করে সংঘাত তৈরি করে।
- **সংশয় ও বিতর্ক:** কিছু সমালোচকের মতে, পশ্চিমা নারীবাদ একটি উপনিবেশবাদী এজেন্ডার অংশ, যা প্রাচ্য থেকে সম্পদের প্রবাহ বজায় রাখতে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি তৈরি

করে। তাদের মতে, মুসলিম নারীবাদীরাও এই উপনিবেশবাদী এজেন্ডার অংশ হিসেবে কাজ করে।

- **ইসলামী নারীবাদ:** এই বিতর্ক সত্ত্বেও, ইসলামী নারীবাদীরা কোরআন ও হাদিসের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তাদের মতে, ইসলাম ধর্মে নারীর মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তবে বিদ্যমান ব্যাখ্যাগুলো মূলত পুরুষতান্ত্রিক।
- **নতুন আলোচনা:** এই পরিস্থিতিতে, উত্তর-ঔপনিবেশিক মুসলিম সমাজে লিঙ্গ, অধিকার এবং নারীর ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনা নতুন মোড় নেয়, যা আজও চলমান।

মুসলিম নারীবাদ: উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন (একটি বিতর্কিত দৃষ্টিকোণ)

- **উপনিবেশবাদী প্রভাব:** উপনিবেশবাদের পদচিহ্ন বলতে এমন ধারণাকে বোঝানো হয়, যা মুসলিম নারীবাদকে উপনিবেশবাদী সংস্কৃতির একটি প্রভাব হিসেবে দেখে।
- **পশ্চিমা মডেল:** কিছু সমালোচকের মতে, কিছু মুসলিম নারীবাদী গোষ্ঠী পশ্চিমা নারীবাদের মডেল অনুসরণ করে, যা স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ইসলামিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক।
- **বৈধতা:** এই সমালোচনাগুলি দেখায় যে, মুসলিম নারীবাদকে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা এবং উপনিবেশবাদের প্রভাবকে বিবেচনায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

_________★★★________

মাতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ: মুসলিম নারীবাদীদের অবস্থান

"মাতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ধারণাটি মুসলিম নারীবাদীদের মধ্যে একটি বিতর্কিত বিষয়। কিছু মুসলিম নারীবাদী মাতৃত্বের ঐতিহ্যগত ধারণার সমালোচনা করেন, যেখানে নারীদের কেবল মাতৃত্বের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের অন্যান্য ভূমিকা, যেমন পেশাগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে অবদানকে উপেক্ষা করা হয়। তারা মনে করেন, এটি নারীদের উপর চাপানো একটি বোঝা, যা তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দেয়। অন্যদিকে, কিছু মুসলিম নারীবাদী মাতৃত্বকে নারী স্বাধীনতার একটি অংশ হিসেবে দেখেন। তারা বলেন, মাতৃত্ব একটি নারীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটি নারীদের নিজস্ব পছন্দ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে।

বিয়ে নাকি ক্যারিয়ার? আধুনিক বিশ্বের অসংখ্য মুসলিম তরুণী এ প্রশ্নে আসে দ্বিধাদ্বন্দে ভোগে। তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার কেউ থাকে না। একপর্যায়ে তারা কাফিরদের মতাদর্শ অনুসরণ করতে থাকে। এ যাত্রার শেষ হয় দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে।

অনেক মুসলিম নারীই তোতাপাখির মতো নারীবাদের বুলি আওড়ায়। জীবনের দীপ্ত একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা অবাক হয়ে ভাবে, 'আমি এত একা এবং নিঃসঙ্গ কেন?' এই পয়েন্টে এসে অনেকেই মুসলিম পুরুষদের ভীতু এবং কাপুরুষ বলা শুরু করেন। মেয়েদের সকল পশ্চাৎপদতার পেছনে পুরুষই একমাত্র কারণ ইত্যাদি ভয়াবহ সব অপবাদ দিতে থাকেন। মুসলিম পুরুষরা নাকি 'ক্ষমতাবান' স্বাধীন মুসলিম নারীদের সাথে চলতে ভয় পায়!

আমাদের দ্রুত সজাগ হতে হবে। বর্তমানে আরও বেশি। কেননা ধর্মকে বর্জন হোক বা ফেমিনিজমের 'ইসলামি নাম দিয়ে হোক, অসংখ্য মুসলিম নারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ব্যক্তিজীবনে এসব বিষাক্ত, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মতাদর্শ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

যেসব নারীরা হালাল ক্যারিয়ার বেছে নিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো কথা নেই। আমার মা ছিলেন ধার্মিক নারী, পেশায় চিকিৎসক। আমি নিজে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছি। কলেজ জীবনের সেই সাদাসিধে দিনগুলোতে আমরা অনেক সামাজিক কাজ করতাম, 'বিশ্বকে পরিবর্তন করার স্বপ্ন দেখতাম, নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতাম। চরম আর্থিক দুরবস্থার কারণে অন্য কোনো উপায় নেই এমন অনেক বোন আছেন। তাদেরকে নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। বরং আমার ক্রোধ এমন এক ব্যবস্থার প্রতি যেখানে ক্যারিয়ারই নারীর একমাত্র মূল্য, এর বাইরে নারী যেন কিছুই নন। ফলস্বরূপ নারীকে আজ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

আমি নিজেকেও এ প্রশ্ন নিয়ে লড়াই করতে হয়েছে। ঠিক আছে আমি একজন স্ত্রী এবং মা, কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট? নারী হিসেবে আমি যোগ্য তো? বেশ কয়েক বছর পর আমি বুঝতে পেরেছি, আসলে এ প্রশ্নটা নিজেই বিষাক্ত। একজন ভালো স্ত্রী এবং একজন ভালো মা হওয়ার চেয়ে সেরা আর কী আছে? এর চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং আর কি হতে পারে? আর এর চেয়ে

বেশি পরিপূর্ণতা আর কীসের মাধ্যমে আসতে পারে? একটি সুসংহত, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ পরিবারই তো ধীরে ধীরে গড়ে তুলবে একটি সুদৃঢ় মুসলিম উম্মাহ। এর প্রতিষ্ঠায় কাজ করার চেয়ে বেশি কার্যকরী বিষয় আর কী আছে?

নারীবাদ এতে খুশি না। তাদের মতে, আমাদেরকে 'আরও বেশি কিছু' হওয়া যাবে'। ১৯] তাদের মতে, প্রয়োজন। এভাবেই নাকি 'নারীদের সম্ভাবনা পূরণ করা যাবে'।" নারীর আসলে স্বামী এবং সন্তানকে সময় দেওয়া উচিত না। তাদের বরং উচিত তাদের মূল্যবান সময় দিন, সপ্তাহ, এমনকি বছরও অর্থ, খ্যাতি এবং নেতৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করা। এভাবে নারীর কিছু অর্জন হয় বটে, কিন্তু হারায় অনেক বেশি কিছু। যেখানে পুরো সিস্টেমই নারীদেরকে এসব শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর, আমরাই পারি বদলাতে। কেননা, তাদের ষড়যন্ত্র আমাদেরকে নিয়েই। আমরাই পারি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে।

দুঃখজনকভাবে, কিছু মুসলিম এ কাজই করছেন। এ বিষাক্ত মানসিকতা ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

কেন কেউ আমাকে বিয়ে করতে চায় না?

আধুনিক নারীবাদীরা নারীদেরকে সবার ওপরে ক্যারিয়ারকে প্রাধান্য দিতে বলে। এর জন্য তারা সোশ্যাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া থেকে শুরু করে কোনটার সাহায্য নেয় না? 'ক্ষমতাবান হোন!' এ স্লোগান জপ করে তারা। 'স্বাধীন হোন!', 'মাথায় পুশি হ্যাট/জেনিটালিয়া হ্যাট পরে উইমেনস মার্চে যোগদান করুন', 'বিশ্বকে পরিবর্তন করার জন্য একজন ঠোঁটকাটা নারীকর্মী হয়ে ওঠুন', 'পুরুষতন্ত্রকে হত্যা করুন' পুরুষরা দুষ্ট, বিষাক্ত এবং স্বার্থপর। তারা আপনাকে দাসী বানাবেই। কাজেই স্বামীর আনুগত্য করবেন না। বরং একটি চাকরি খুঁজে বের করুন এবং আপনার বসের আনুগত্য করুন! মজুরির বিনিময়ে দাসী হোন! এটাই স্বাধীনতা। এতে আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতেই হবে। কেননা একজন পুরুষ যা করতে পারে তা আপনিও করতে পারছেন। একজন পুরুষ হাই প্রোফাইল ক্যারিয়ার পেতে পারে। তাহলে আপনি কেন নন? এটা নারীবাদ। ইসলাম ঠিক তার বিপরীত। তাহলে যে নারী তার ক্যারিয়ারের চেয়ে স্বামী, সন্তান এবং গৃহের প্রতি বেশি নিবেদিত এমন একজনকে স্ত্রী হিসেবে চাওয়া কেন দোষের হবে?

বাসায় তৈরি খাবারের মূল্য

মানুষ নারীবাদী কর্মীদেরকে দূর থেকে সমর্থন করে ঠিকই কিন্তু নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বের হতে তারা রাজি নয়। প্রতিদিন বাড়িতে রান্না করা গরম খাবার তাদের ঠিকই চাই।'

এটাই কি স্বাভাবিক না? সারা দিনের ক্লান্তি শেষে বাড়িতে এসে স্বাচ্ছন্দ্য এবং রান্না করা গরম খাবারের আশা করা কি অযৌক্তিক? কোনো পুরুষের বিয়ে নিয়ে এমন ধারণা পোষণ করা কি প্রমাণ করে যে তিনি নিকৃষ্ট, সেক্সিস্ট ১৯৬] কিংবা নিপীড়ক?

একজন নারী নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করতে হবে, আসলে তার মূল্য কোথায়? প্রতিদিন অনলাইনে আমরা অনেক হাই প্রোফাইল ক্যারিয়ার-সম্পন্ন নারীর গল্প দেখি। হয়তো তারা ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বছরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তারা বিয়ে করেনি, বাচ্চা নেয়নি।

এমন অসুস্থ পরিবারের অসুস্থ নারীদের জীবনকাহিনি দেখে আধুনিক মুসলিম মেয়েরা হতাশ হয়। যদি তারা জানত, কত বড় কিছু হারিয়েছে তারা জীবনের তারা আফসোস করবে, করে, 'কেন আমি শুধু একটা চাকরির জন্য আমার জীবনের সেরা সময়গুলো ধ্বংস করেছি? চাইলেই তো আমি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একটি পরিবার গঠন করতে পারতাম। এখন আমি শারীরিকভাবে সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। আমি কখনো একটি বড় পরিবারের অংশ হতে পারব না। এর জন্য কে দায়ী?'

তবে **পুরুষ নারীর মতো নয়(আপনার পছন্দ না হলে কিছু আসে যায় না)**

রাসুলের এ অন্যান্য স্ত্রীদের বেশিরভাগেরই তেমন কোনো সম্পদ ছিল না, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষাও ছিল না। ইবাদাতের বাইরে বেশিরভাগ সময়ই তাঁরা রাসুল এবং তাঁর মেহমানদের জন্য রান্না করতেন, বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন এবং গৃহস্থালির কাজকর্ম সামলাতেন। তাঁরা কি উম্মুল মুমিনিনদের অন্তর্ভুক্ত নন? এমনও তো নয় যে আয়েশা রা. গৃহস্থালি কাজ করেননি কিংবা রাসুলের দেখাশোনা করেননি।

এসব নারীবাদীরা কেন মারইয়াম আ.-এর কথা বলে না? মারইয়াম আ. ছিলেন ঈসা আ.-এর মা। সমগ্র নারীজাতির মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক ছিলেন তিনি। তিনিই একমাত্র নারী যার নাম কুরআনে এসেছে। সুরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

'এবং যখন ফেরেশতারা বলেছিল, হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং আপনাকে পবিত্র করেছেন এবং আপনাকে বিশ্বের সকল নারীর ওপরে সম্মানিত করেছেন।' [সুরা আলে ইমরান ৪২]

তিনি হলেন সমগ্র নারীজাতির জন্য আদর্শ। ইয়াকিন এবং ইবাদতের বাইরে তাঁর এ মহান সম্মানের একমাত্র কারণ তাঁর মাতৃত্ব। ইসলামে নারীর সম্মান এবং গুরুত্বের মূল কেন্দ্র মাতৃত্ব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কর্পোরেট কোম্পানিতে চাকরি করা, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করা এবং পরিবার অস্বীকার করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। তাহলে কেন মুসলিম পুরুষরা তাদেরকে বিয়ে করতে বাধ্য?

মুসলিম নারীবাদীদের অবস্থান

- **মাতৃত্বকে একটি সামাজিক বোঝা হিসেবে দেখা:** কিছু মুসলিম নারীবাদী মনে করেন, মাতৃত্বের ঐতিহ্যবাহী ধারণাটি নারীদেরকে পুরুষের অধীনে রাখে এবং তাদের নিজেদের পেশা, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দেয়।
- **মাতৃত্বকে একটি ঐচ্ছিক পছন্দ হিসেবে দেখা:** কিছু মুসলিম নারীবাদী মনে করেন, মাতৃত্ব নারীর জীবনের একটি অংশ, তবে এটি নারীর চূড়ান্ত পরিচয় নয়। তারা মাতৃত্বকে নারীর নিজস্ব পছন্দ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হিসেবে দেখেন।
- **ইসলামী ঐতিহ্য ও আধুনিকতা:** মুসলিম নারীবাদীরা ইসলামী ঐতিহ্য ও আধুনিকতা- উভয়কে বিবেচনা করেন। তারা বলেন, ইসলামী ঐতিহ্য নারীদের মাতৃত্বের প্রতি সম্মান দেখায়, কিন্তু আধুনিক যুগে নারীরা কেবল মাতৃত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না।

- **ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা:** কিছু মুসলিম নারীবাদী ইসলামী আইনের কিছু ব্যাখ্যাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন, যেখানে নারীর অধিকারকে সীমিত করা হয়। তারা বলেন, ইসলামী আইন নারীর অধিকার রক্ষা করে, তবে তা অপব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মুসলিম নারীবাদীদের মধ্যে মাতৃত্বের বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান নেই। কিছু মুসলিম নারীবাদী মাতৃত্বকে সামাজিক বোঝা হিসেবে দেখলেও, অন্য অনেকে এটিকে নারীর নিজস্ব পছন্দ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হিসেবে দেখেন। এই বিষয়ে তাদের অবস্থান নির্ভর করে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর।

_________★★★_________

নারীবাদ-নারীমুক্তি নাকি নারীত্ব তথা মানবতার ধ্বংস?

মানুষের ভেতরে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার, নিজেকে পরিবর্তন করার এবং উত্তরণ ও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা তার সবচেয়ে চমৎকার বহিঃপ্রকাশ হলো ইতিহাস জুড়ে বারবার জেগে ওঠা নানা আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলো কখনো ব্যক্তিগত আত্মজিজ্ঞাসা থেকে, কখনো-বা সমষ্টিগত বোধ থেকে জন্ম নিয়েছে। তারা মানুষের পরিচয়কে নতুন করে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে মানুষ আসলে কে, তার জীবনের মানে কী, কোথায় তার চূড়ান্ত গন্তব্য এবং সে কোন দিকে এগোবে। এসব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তারা গড়ে তুলেছে নানা মতাদর্শ, যার মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজে পেয়েছে এবং জীবনের জন্য এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা দিকনির্দেশনা খুঁজে নিতে পেরেছে।

রাজনৈতিক পরিসবে আমরা সাম্যবাদ, সমাজবাদ, উদারনৈতিকতাবাদ ও রক্ষণশীলতাবাদের মতো নানা মতাদর্শের উত্থান ও পতন প্রত্যক্ষ করেছি। একইভাবে, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের জগতে বহু দর্শন ও চিন্তাধারার আগমন ঘটেছে, তাদের কেউ কেউ একসময় শক্ত প্রভাব ফেললেও সময়ের প্রবাহে অনেকটাই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবে এসব মতাদর্শ ও তত্ত্বের ভিড়ে এমন একটি আদর্শ আছে, যা আমাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সহজাত নিয়ম ও স্রষ্টা-নির্ধারিত। প্রাকৃতিক বিধানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়ানক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। আমরা এই আদর্শকে চিনি 'নারীবাদ' নামে।

১৯৭০ ও ৮০-এর দশক থেকে, থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে। নারীবাদী আন্দোলনের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেতে শুরু করে। তখন তা নিছক নারীমুক্তি আন্দোলন হয়ে থাকেনি বরং তা হয়ে উঠেছিলো প্রথাগত নারীত্বের ধারণাকে ভেঙে ফেলার এবং নারীকে পুরুষের আদলে গড়ে তোলার একটি মতবাদ। পুরুষকে উপস্থাপন করা হয় নারীর উন্নয়ন ও স্বাধীনতার পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা হিসেবে।

দার্শনিকভাবে নারীবাদ মূলত নারীত্বের ব্যাপারে এক প্রকারের মানবতাবারি (humanist) কিংবা সেকুলার মতাদর্শ, যা মহিলাদেরকে নিজঘ্র সকল বৈশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য থেকে সুরত করে নারী ও পুরুষকে হুবহু একই রকম দেখানোর চেষ্টা করে এবং দিনশেষে পুরুষ হোক কিংবা নারী, প্রত্যেককেই সে নিছক অর্থনৈতিক পণ্য কিংবা মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে। অত্র বইয়ের লেখকের মতে (নারীবাদ) মূলত দুই লিজের মধ্যে ভয়াবহ এক যুদ্ধের ঘোষণা। তাঁর ভাষায়-

"নারীবাদ সাম্রাজ্যবাদী এবং 'নিজ' ও 'অপর'-এর মধ্যে নিরেট দ্বৈতবাদী চিন্তাধারা থেকে উৎসারিত। নারী ও পুরুষ জড়িয়ে পড়ে বিরামহীন এক যুদ্ধে, যেন এদের মধ্যে কোনো মিল, সাদৃশ্য, সাধারণত বলতে কিচ্ছুটি নেই; এরা যেন একই মানবজাতির সদস্যই না।"

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে নারীবাদ মূলত দুই লিঙ্গের মধ্যকার যুদ্ধের চাইতেও বেশি কিছু। এটা হচ্ছে মূলত দুটি স্বতন্ত্র ও পৃথক লিঙ্গের দ্বৈততা ও পার্থক্যকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়ে জগৎকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা। অন্যদের মত ড. আলমাসিরীও এই নববিন্যাসের বেশ কয়েকটি স্তর বা ধাপ চিহ্নিত করেছেন, যার মাধ্যমে নারীবাদীদের ভাষ্যমত আধুনিক সমাজ লিঙ্গহীন সমাজের দিকে অগ্রসর হতে পারে।
নারীবাদের এই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীকে এমন এক উভলিঙ্গ (androgynous) সত্তায় রূপান্তরিত করা, যেখানে লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য মুছে যাবে। এর মাধ্যমে নারীর একটি নতুন আত্ম-পরিচয় নির্মিত হবে বলে তাদের ধারণা-যা তাকে তার ঐতিহাসিক ও জৈবিক নারীত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তথাকথিত মুক্তির নতুন দ্বার উন্মুক্ত করবে।

এই নব-পরিচয় নারীকে বিমানবীকৃত (dehumanized) উভলৈঙ্গিক এক সত্তা হিসেবে দেখে, যে কিনা কর্মক্ষেত্রে 'পুরুষের মতই কর্মসম্পাদন ও আয়-রোজগার করতে সক্ষম'। ড. আলমাসিরী বিনির্মাণের এই স্তর সম্পর্কে বলছেন-
"দ্বৈত কিংবা অদ্বৈতবাদী কাঠিন্য (solidity) দ্রুতই তরল অদ্বৈতবাদে পর্যবসিত হয়, যা পুরুষ ও নারীর মধ্যকার সকল পার্থক্যকে চুটকিতেই উড়িয়ে দেয়। নারীরা পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তা থেকে দ্রুতই প্রাকৃতিক (জড়) সত্তায় রূপান্তরিত হয়, যাকে বস্তুর মাঝে অনুপ্রবিষ্ট প্রাকৃতিক আইনের সাহায্য পরিপূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব। এরপর নারীকে পুরুষ নামক আরেক প্রাকৃতিক জড়সত্তার স্তরে নামিয়ে আনা হয়। সেই নারীকে ধরে নেওয়া হলো সে কোনো দিক থেকেই পুরুষের চেয়ে আলাদা নয় বরং সমাজে তাদের ভূমিকা অবিকল পুরুষের মতই। এভাবে নারী ও পুরুষ উভয়কেই প্রকৃতি-জড় (nature-matter) এই কাঠামোর আলোকে দেখা শুরু হলো। এখন তাদের মধ্যে মিল আর এটা না যে তারা উভয়েই মানবজাতির সদস্য বরং মিল তারা দুজনেই প্রকৃতি-জড় কাঠামোর-ফসল এই দিক থেকে। এই ব্যাখ্যা-প্রকল্প লিঙ্গকে গোনায় ধরে না। যার ফলে পুরুষও নারীর সাথে একই রকম বলে চিত্রিত হলো।"

লেখক আলমাসিরী, যিনি এ বিষয়টি নিয়ে অন্যকার চিন্তকদের চাইতে অধিকতর সারগর্ভতা ও সততার সাথে আলোচনা করেছেন। বলছেন,
"(নারীবাদ আসলে) মানবতাবাদ (Humanism) থেকে প্রকৃতিবাদ-বস্তুবাদ (Naturalism-Materialism) মতাদর্শের দিকে রুপান্তরকে নির্দেশ করে এবং প্রকৃতি-জড় চিন্তা-কাঠামোর (Paradigm) একচেটিয়া আধিপত্যের পরিচয় বহন করে।"
লেখক আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই চিন্তা-কাঠামোগত পরিবর্তনের (Paradigmatic Shift) সামগ্রিকতা ও লিঙ্গযুদ্ধকে এভাবে বর্ণনা করছেন-
নারীমুক্তি আন্দোলনের (women liberation movement) উদ্দেশ্য ছিল নারীর জন্য সামগ্রিক ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে নারীবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন রাস্তা অবলমন করে, যার

মূল প্রস্তাব হলো-গোটা জগৎ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের জায়গা। তখনই গোটা মানবজাতির ইতিহাস পরিণত হস্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যকার যুদ্ধ-সংগ্রাম, নারীর ওপর পূরুদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার এবা নারীর সেই আধিপত্যের বন্ধন ছিঁড়ে মুক্ত হওয়ার মহা-আখ্যানো"

নারীবাদের প্রথম ধাপ হলো-নারীদের সহজাত নারীত্ব থেকে সরিয়ে নিয়ে এট উভলিঙ্গ বা সমলিঙ্গ নারী হিসেবে পুনর্গঠনের চেষ্টা করা। এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়, যার লক্ষ্য এই চিন্তার বিপ্লবকে আরও এক ধাপ এগিয়ে সেজ তখন এই বিপ্লব কেবল নারীর অস্তিত্ব বা পরিচয়কেই নয় বরং নারী ও পুরুষ, পিছ লৈঙ্গিক সম্পর্কসহ যাবতীয় বিষয়ে চিন্তার কাঠামোকেও আমূল বদলে দিতেঃয়।

এ পর্যায়ে নারীবাদ এমন এক সমাজ কল্পনা করে, যেটি হবে অ-লৈঙ্গিক সয়ে (no gender society)-যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো যাওয়া খ তুমিকা থাকবে না।

ড. আলমাসিরীর বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, নারীবাদীরা নারীর প্রতি পুরুষেরাখ। পুরুষের প্রতি নারীর স্বাভাবিক পারস্পরিক আকর্ষণ ও আবেগকেও ক্ষনচন প্রতিযোগিতা হিসেবে ব্যাখ্যা করে। তিনি বলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ডারউইনের "নির্দয় সংগ্রাম ও অভিযোজনের তত্ত্ব" স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

নারীবাদী চিন্তাধার এই বিচ্ছিন্নতার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। তারা পুরুষতান্ত্রিক ভাষাকেও একধরনের দমনের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। এই বদলে তারা একটি নারীবাদ-প্রভাবিত বিলৈঙ্গিক ভাষার প্রস্তাব দেয়। এই ভাষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-যেসব শব্দ, রীতি বা বাচনভঙ্গিতে নারীর তুলনায় পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেগুলোকে মুছে দিয়ে ভাষার কাঠামো পুনগান করা।

তাদের দাবি ছিল-ভাষায় নিরপেক্ষ, অ-লৈঙ্গিক বিশেষ্য ব্যবহার করতে হবে, অথবা নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা শব্দপ্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, যেন ভাষায় আর কোনো লিঙ্গ-ভিত্তিক আধিপত্য না থাকে। এই ভাষাগত বিপ্লব কেবল পুরুষদের প্রভাব হ্রাস করার চেষ্টা নয় বরং এর গভীরতর লক্ষ্য হলো-লিঙ্গসংক্রান্ত যেকোনো সূত্র, প্রতীক, এমনকি গুপ্ত বা সাংকেতিক লৈঙ্গিক চিহ্নগুলো পর্যন্ত মুছে ফেলা।

যার মানে লিঙ্গসমতার অর্থ দাঁড়ায় কেবল নারীদের তাদের সহজাত নারীত্ববোধ পরিত্যাগ নয় বরং পুরুষদেরও তাদের পৌরুষসূচক সকল বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে হবে-তবেই নাকি প্রকৃত 'সমতা' অর্জিত হবে। এইভাবে নারীবাদ একরকম অলৈঙ্গিক, নির্ণয়হীন মানব-সত্তা গঠনের দিকেই অগ্রসর হয়, যেখানে নারী-পুরুষ পরিচয়ের ভেদরেখা চিরতরে বিলুপ্ত করার প্রয়াস দেখা যায়।

ড. আলমাসিরী প্রকৃত নারীমুক্তি বিষয়ক একটি বিকল্প ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, নারীমুক্তি মানে কেবল সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকারের দাবি নয় বরং

তা হলো সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র ভূমিকা স্বীকার করে, সেই ভিত্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়ের সন্ধান ও তা অর্জনের সংগ্রাম। নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার ধারায় বুঝে নেওয়ার এই প্রচেষ্টা নারীবাদী তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ড. আলমাসিরী নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে প্রকৃত নারীমুক্তির তুলনা টেনে দেখিয়েছেন- নারীবাদ আসলে জায়নবাদের (Zionism) মানসসন্তান, যার শিকড় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির আধিপত্যকামী মনোভাবে লুক্কায়িত আছে। লেখক এই আন্দোলনের ভয়াবহতা, এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা পাঠকের চোখ খুলে দেয়।

তাঁর মতে, সমাজে নারীর যে সকল বৈধ অধিকার ও দাবি রয়েছে, সেগুলোর যথাসময়ে সমাধান না করা হলে নারীবাদীরা এগিয়ে এসে তা 'সমাধান' দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের প্রস্তাবিত সমাধান হবে বিধ্বংসী, বিভ্রান্তিকর এবং সমাজ কাঠামোর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

_________★★★_________

নারীবাদী আন্দোলন

অনেক মানবতাবাদী। অর্থাৎ, প্রকৃতির ওপর মানবজাতির প্রাধান্য, মহাবিশ্বে মানুষের কেন্দ্রীয়তা, প্রকৃতি এমনকি নিজ সত্তাকেও অতিক্রমের মানবীয় সক্ষমতার ওপর আদৃঢ় প্রত্যয় ছিল তাদের মূল চালিকাশক্তি। সমতার সকল দাবি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হতো। বিশ্বাস ছিল মহাজাগতিক ক্রমের (cosmic hierarchy) সবচেয়ে ওপরে মানুষের অবস্থান। বিশ্বাস করা হতো মানুষ স্বাধীন, সৃজনী ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ও অনুপম। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বেশিরভাগ স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের মূলধারা ছিল।

১৯৬০-এর মাঝ থেকে অবস্থান পরিবর্তন হতে লাগল। নব্য-স্বাধীনতাকামী আন্দোলনে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা হয়নি। বরং এ সকল আন্দোলনের মূলধারা ছিল মানবজাতির বিকেন্দ্রীকরণ, মানুষের ওপর প্রকৃতির প্রাধান্য, সমগ্র ও সাধারণ মানবতার ধারণার অস্বীকৃতির দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন। অধুনা স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিরত সংঘর্ষের ওপর গুরুত্বারোপ করে। তাদের কাছে সমস্ত সামাজিক ও মানবীয় ঘটনানিচয় ক্ষমতার সমীকরণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল মাত্র। মানুষ নিছক এক প্রাকৃতিক সত্তা, তুচ্ছ ক্রীড়ানক, যাকে প্রকৃতি-জড়ের চিন্তাকাঠামোর মধ্যে লঘুকৃত (reduced) করে ফেলা যায়, যাকে নিয়ে প্রকৃতি নিজের ইচ্ছামতো খেলে যাচ্ছে। মানুষকে পশুপাখি, উদ্ভিদ, জড়বস্তুতুলা; যার না আছে স্বাধীন ইচ্ছা আর না কোনো যুক্তিবুদ্ধি।

নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারীবাদ

নারীমুক্তি আন্দোলন-এ পরিভাষাটির অর্থ "নারীদের মুক্তি ও তাদের অধিকার রক্ষা। অনেকে ভাবেন এর সবচেয়ে নিকটবর্তী শব্দ নারীবাদ। অনেকে ভাবেন নারীবাদ আর নারীমুক্তি আন্দোলন একই জিনিস। যে-ই লাউ সেই কদুর মত। এখন নারীমুক্তি নারীবাদ। যার কারণে নারীকেন্দ্রিক সকল আন্দোলনকেই এখন নারীবাদ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু গভীরে গেলে দেখা যাবে "নারীবাদ" শব্দটি "নারীমুক্তি আন্দোলন" এর বিপরীতে অবস্থান করছে। নারীমুক্তি আন্দোলন বিশ্বাস করে মানুষের কেন্দ্রত্বে, সাধারণ মানবতায়-যা বরণ করে সকল বর্ণ ও রঙের মানুষকে, নারী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গকেই। মানুষ নিজের মানবত্ব হাসিল করে সভ্যতা ও সামাজিক সম্পৃক্তি (social association) থেকে। তার মানে মানুষ সাংস্কৃতিক ফসল, প্রকৃতি-জড়ের কাঠামো থেকে মুক্ত না। মানুষ সমাজ ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই তাকে প্রাকৃতিক-জড়বাদী প্রকল্পের সাথে মেশানো যায় না।

তাদের মতে নারী সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা না, বরং সমাজসম্পৃক্ত এক ব্যক্তিসত্তা, যার নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা (distinct social roles) আছে। এর লক্ষ্য নারীরা যেন মানুষ হিসেবে,

নারী হিসেবে তার ন্যায্য অধিকারটুকু পায়; তা হোক-রাজনৈতিক (সমান ভোটাধিকার আদায় ও সরকারব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ), সামাজিক (নারীদের বিবাহবিচ্ছেদের ও সন্তানের ভার নেওয়ার অধিকার), অর্থনৈতিক (পুরুষ ও নারীর সমান বেতন ও মজুরি)।

নারীমুক্তির পক্ষে থাকা অনেক চিন্তক মাঝেমধ্যে বুর্জোয়া চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের পরিভাষা ব্যবহার করেন, যেখানে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে পারস্পরিক সুবিধা নির্ভর একধরনের চুক্তি হিসেবে দেখা হয়। কখনো কখনো তারা নারীদেরকে সামাজিত প্রেক্ষাপটবিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্বায়ত্তশাসিত সত্তা হিসেবেও উপস্থাপন করেন-যেন তাদের পরিচয় সমাজ, পরিবার বা ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে আলাদা করে ব্যাখ্যা করা যায়। আবার অন্য সময়ে নারীদেরকে দেখা হয় মাতৃত্ববোধহীন, কেবল অর্থনৈতিক বা যৌনতাতাড়িত জীব হিসেবে-যা একান্তভাবে আধুনিক ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এতৎসত্ত্বেও তাদের মূলভিত্তি মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ফারাক সুস্পষ্ট। তাদের কাছে মানুষ-ই মহাবিশ্বের কেন্দ্র, তাদের অটুট বিশ্বাস সাধারণ মানবতায়।

তারা নারীর প্রথাসম্মত ভূমিকার ব্যাপারে সুপ্রতিষ্ঠিত মানবীয় ধারণাকে-যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মাতৃত্ব-গ্রহণ করে। তাদের কাছে পরিবার হলো সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক, যার মাধ্যমে মানুষ নিরাপত্তা ও স্বস্তি লাভকরে। পূর্ণ করে নিজের মানবসত্তার পরম-সার, লাভ করে স্বকীয় নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। অসম্ভব কিংবা অবাস্তব কোনো ধারণার ব্যবহার এরা করে না, কিংবা সকল কিছুকেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের মুখোমুখি করে না। এটাই ছিল ১৯৬০ পর্যন্ত চলা নারীমুক্তি আন্দোলনের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ।

_________★★★_________

হারমেনিউটিক্স ও ইসলামের নারীবাদী ব্যাখ্যা

শায়খ ড. হাসান শাফিয়ী

বিশ্লেষণ করব একটি বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ব্যাপারে, যা সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামি বিশ্বে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। এর অনুসারীরা নসের (অর্থাৎ, কুরআন ও হাদিসের) ব্যাখ্যায় মুসলিম ঐতিহ্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করে, এবং তার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের তৈরি হারমেনিউটিক্স (ব্যাখ্যাতত্ত্ব) প্রয়োগ করতে চায়।

মূল আলোচনায়-ইসলামের নারীবাদী ব্যাখ্যার উৎস বিশ্লেষণ-প্রবেশের পূর্বে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরী। আমরা সংস্কৃতিসমূহের আন্তঃযোগাযোগ প্রশংসনীয় লক্ষ্য। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বায়নের পরিস্থিতিতে এটা অপরিহার্য ও আন্তঃসংলাপের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করি। নিঃসন্দেহে এটা অনিবার্য এক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা,

১. বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরবি-ইসলামি সংস্কৃতির মূল চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম মানবজাতির একত্ব এবং একটি যৌথ উৎসের ধারণার ব্যাপারে বিশ্বাসী। মানুষের জাতি, গোষ্ঠী বা ভাষাগত পার্থক্যকে ইসলাম সংঘর্ষের কারণ নয়, বরং পারস্পরিক পরিচিতি, বোঝাপড়া এবং সৌহার্দ্যের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে।

২. আমাদের পূর্বসূরিরাও এমন আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগে অংশগ্রহণ করেছেন-কোনো প্রকার বর্ণবাদ, স্থবিরতা কিংবা সংস্কারবদ্ধতা থেকে মুক্ত থেকে। ইসলামি সভ্যতার বিকাশকালীন সময়ে এই ধরনের বিনিময় ও সংলাপ তাদের জন্য একটি শক্তি ও সমৃদ্ধির উৎসে পরিণত হয়েছিলো। তারা কখনো সংকীর্ণতা বা দ্বিধায় ভোগেননি। উদাহরণস্বরূপ, প্রখ্যাত দার্শনিক আবু ইয়াকুব আল-কিন্দি ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগে লিখেছেন,

"যে বা যারা সামান্য পরিমাণে হলেও সত্য নিয়ে আসে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা বাঞ্চনীয়। আর যে বহুল পরিমাণে সত্য আনে তার ব্যাপারে তো কোনো কথাই থাকতে পারে না। কেননা তারা নিজেদের চিন্তা আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছে ও জ্ঞানান্বেষণকে সহজ করেছে... সত্য যেখান থেকেই আসুক না কেন, এমনকি দূরের কোনো অঞ্চল বা ভিন্ন কোনো জাতির কাছ থেকে হলেও, তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতে কোনো প্রকার লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। তাকে অকপটে গ্রহণ করে নিতে হবে। কেননা সত্যান্বেষীদের জন্য সত্যের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই!"

শতাব্দী পরে ইসলামি সভ্যতার সমৃদ্ধির শিখরে থাকা অবস্থায় ইবনু রুশদ একই কথা বলছেন,

"সত্যের সন্ধানে পূর্ববর্তীরা কী বলেছেন তার দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এমনকি যদি সে আমাদের ধর্মের নাও হয়। 'আমাদের ধর্মের নাও হয়' বলতে বুঝিয়েছি সে সকল প্রাচীন বুদ্ধিজীবীগণ যারা ইসলাম আবির্ভাবের আগে পৃথিবী থেকে গত হয়েছেন। তাদের বইপত্র অধ্যয়ন ও তাদের মতামত অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। যদি তাদের সকল কথাই সঠিক হয় তবে তা গ্রহণ করে নেব, আর যদি কোনো ভুলভ্রান্তি থেকে থাকে তবে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।"১

গ. বিংশ শতাব্দীর তথ্য বিপ্লবের পরে সাংস্কৃতিক বিনিময়, যোগাযোগ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মূল প্রশ্ন হলো-কুরআন ও দ্বীন ইসলামের নারীবাদী ব্যাখ্যা কী আদৌ সেই মেজাজের সাথে যায় যেমনটা আল-কিন্দি ও ইবনু রুশদ বর্ণনা করেছেন নাকি তা ভিন্নদিকে পরিচালিত হয়েছে বা হচ্ছে? আশা করি ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা পাবো।

হারমেনিউটিক্স

ধর্মীয় শাস্ত্রের পাঠ, ব্যাখ্যা ও গভীর উপলব্ধির যে শাস্ত্র তাকে হারমেনিউটিক্স বলা হয়।

হাবমেনিউটিক্স শব্দটি একাধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ ও প্রয়োগ সময় ও চিন্তাধারার পরিবর্তনের সাথে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এর কিছু মূল অর্থ ও ব্যাখ্যা নিচে তুলে ধরা হলো:

ক. ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার মৌলিক নীতি।

খ. বিশেষভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের পদ্ধতি।

গ. প্রাচীন ভাষ্য ও গ্রন্থগুলো বুঝতে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান।

ঘ. ধর্মীয়, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ভাষ্য ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি।

৪. শুধু ধর্মীয় বা সাহিত্যিক ভাষ্য নয়, বরং সব ধরনের ব্যাখ্যাযোগ্য পাঠ বোঝার পদ্ধতিগত জ্ঞান।

চ. এমনকি যে কোনো লিখিত দলিল, নথিপত্র বা আইনি দলিল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার আছে।

ছ. হারমেনিউটিক্সের সবচেয়ে বিস্তৃত ও দার্শনিক অর্থ হলো-মানবীয় অস্তিত্ব ও তার অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা ও বিশ্লেষণ করা। আধুনিক দার্শনিকেরা সাধারণত এই ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করেন।

এই বিস্তৃত অর্থে হারমেনিউটিক্সের ব্যবহার শুরু করেন জার্মান দার্শনিক এডমুন্ড হুসেল, যিনি অবভাসবাদের (Phenomenology) জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ভুল ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকতে এ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। এরপর

(Schleiermacher) এবং ডিলথি (Dilthey) হারমেনিউটিক্সকে আরও গভীর ফ্রিডরিখ শ্লায়ারমাহার ও বিস্তৃত করেন, বিশেষ করে মানুষের অভ্যন্তরীণ অভিপ্রায় ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সংযোগ ব্যাখ্যায়। পরে মার্টিন হাইডেগার হারমেনিউটিক্সকে দার্শনিক উচ্চতায় নিয়ে যান, যেখানে মানুষের অস্তিত্ব ও তার উপলব্ধির পদ্ধতি এই শাস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পায়। সংক্ষেপে বলা যায়, হারমেনিউটিক্সের গোড়াপত্তন যদিও ধর্মতাত্ত্বিকদের হাতে হয়, তবে এর প্রকৃত বিস্তার ও দার্শনিক গভীরতা অর্জিত হয়েছে দার্শনিকদের মাধ্যমে।

_________★★★________

হারমেনিউটিক্সের ইতিহাস ও বিবর্তন

ক. হারমেনিউটিক্সের ইতিহাস অনেক পুরাতন। এর সূত্রপাত হয় গ্রিকদের মাধ্যমে, যেকোনো পাঠ্যের প্রতীকধর্মী বা রুপক ব্যাখ্যায় তারা অধিক আগ্রহী ছিলো।

খ. ইতিহাসের একটি পর্যায়ে আসে ইহুদীরা। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত দার্শনিক ফিলো ইহুদি ধর্মতত্ত্বে গ্রিক দর্শন ও প্রতীকধর্মী ব্যাখ্যাপদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটান। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত, প্রায় আটশত বছর ধরে গুরুদীরা হিব্রু বাইবেলের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছে, তা 'তালমুদ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই দীর্ঘ ব্যাখ্যাচর্চার ধারায় ইহুদীরা ভাষ্য ও বিশ্লেষণের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুটি ভিন্নধর্মী প্রবণতা দেখা যায়-একদিকে ছিল অক্ষরবাদীরা, যাদের মধ্যে সাদুসীয় (Sadducees) ও কারাইতীয়রা (Karaites) ছিল প্রধান; অন্যদিকে ছিল প্রতীকধর্মী বা রূপকভিত্তিক ব্যাখ্যাকারীরা, এরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অধিকতর প্রভাবশালী, বিশেষত কাব্বালা সম্প্রদায়ের মধ্যে।

গ. হারমেনিউটিক্সের বিকাশ এবার ঘটে চার্চপন্থী খ্রিস্টানদের মাঝে। তাদের মাঝেও প্রতীকধর্মী ব্যাখ্যার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। তবে চার্চের পণ্ডিতগণ পবিত্র ধর্মশাস্ত্রকে বোঝার জন্য কিছু মূলনীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, যা 'অগাস্টিনীয় চতুর্বিধি' বিশেষভাবে পরিচিত,

১. শাস্ত্রকে শাস্ত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা, যদি সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ, বাইবেলের এক অংশকে আরেক অংশ দিয়ে ব্যাখ্যা করা।

২. রূপকধর্মী ব্যাখ্যা, তবে তা হতে হবে প্রসঙ্গ-সূত্রসমর্থিত, যা আক্ষরিক ব্যাখ্যার বাহিরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে ও বৈধতা দান করে।

৩. ভাষিক সূত্র অনুযায়ী ব্যাখ্যা, এর মাধ্যমে শব্দ ও পদের গুঢ়ার্থ জানা সম্ভব হয়।

৪. ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা।

ঘ. এবার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের গণ্ডি চার্চ ছেড়ে বেরিয়ে আসলো। বিদ্রোহ হয় চার্চের সংকীর্ণতা ও কাঠিন্যের বিরুদ্ধে, বিশেষত মার্টিন লুথার ও জন ক্যালভিনের হাত ধরে। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-

মার্টিন লুথার

১. তিনি বাইবেল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পোপ ও চার্চের নিরঙ্কুশ আধিপত্য অস্বীকার করেন।

২. বাধাধরাহীন প্রতীকধর্মী ব্যাখ্যাকেও তিনি মেনে নিতে পারেননি।

৩. তার বিশ্বাস ছিল ব্যাখ্যাকারীকে অবশ্যই ঐতিহাসিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হবে বাইবেল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে।

৪. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাইবেল নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করে-অর্থাৎ, ভাষিক বিশ্লেষণ ও পবিত্র আত্মার নির্দেশনার সাহায্যে।
বোঝা যাচ্ছে, এ সকল নীতি অগাস্টিনের চতুর্বিধির আংশিক সংস্করণ।

জন ক্যালভিন

তিনি লুথারের সাথে অনেকটাই একমত ছিলেন তবে প্রতীকধর্মী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অধিকতর রক্ষণশীল ছিলেন। তার মতে বাইবেল ব্যাখ্যার নীতিমালা হলো,

১. পোপের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব অস্বীকার করা।
২. বাইবেল পাঠ্যের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ-সূত্র বিবেচনা।
৩. ভাষিক নিয়মনীতি বিবেচনা করা।
৪. রূপকধর্মী বা প্রতীকধর্মী ব্যাখ্যা নাকচ করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এত সব নীতিমালার অবতারণা এই কারণেই, যাতে হারমেনিউটিক্স মূর্খ ও অপরিণত ব্যক্তিদের জন্য এক স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণহীন মাঠে পরিণত না হয়ে একটি সুসংবদ্ধ নীতিনির্ভর শিল্প থাকে।

একই রকম বিচারমূলক (critical) মানসিকতা নিয়ে পড়তে হবে। এর ফলে গছে ওঠে নানা প্রকারের স্বরবাদ (Deism), যা চার্চ এমনকি ধর্মের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী মানসিকতার জন্ম নেয়। যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতার (objectivity) আধিপত্য বাড়তে থাকে। এসময়ে যেহেতু পাশ্চাত্যের চিন্তকদের মধ্যে স্বাধীনতা ওপর ভর করে ধর্মীয় পাঠ্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যক্তিবাদের (subjectivity) ও একচ্ছত্র মানবতাবাদের প্রভাবে হু হু করে বাড়তে থাকে। চিন্তাবিদদের অনেকেই স্বাধীনতার নামে 'ধর্মীয় কিংবা আপ্ত' নামের সকল কিছুকেই বর্জন করে দিচ্ছে-যুক্তি, বিজ্ঞান ও নৈর্ব্যক্তিকতার সিঁড়ি বেয়ে। এ কারণে বলা যায় আধুনিক হারমেনিউটিক্স যুক্তিবাদী, এনলাইটেনমেন্টীয় ও মানবতাবাদী দর্শনের কোলে জন্মগ্রহণ করে। শ্লায়ারমাহার অষ্টাদশ শতাব্দীতে হারমেনিউটক্সকে জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তির (epistemological basis) ওপর স্থাপিত করে। হুসের্ল যৌক্তিক বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হারমেনিউটিক্সকে ব্যবহার করে। হারমেনিউটিক্সকে বিভিন্ন মানবিক ও দার্শনিক পাঠ্য-অধ্যয়নে বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে হুসেলের ছাত্র হাইডেগারের ভূমিকা অপরিমেয়।

ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র ধর্মশাস্ত্রের নারীবাদী ব্যাখ্যার প্রবণতার কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য যদি সংক্ষেপ বলতে হয় তা হবে,

১. ধর্মীয় গ্রন্থের ঐতিহাসিকীকরণ: শুধু হাদিসই নয়, স্বয়ং কুরআনকেও ঐতিহাসিকীকরণ করা। এর মানে হলো, কুরআনের আয়াতগুলোকে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিচার করা হবে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, কুরআনের কিছু আয়াত বাতিল করা

হোক, সেগুলোর পরিবর্তে নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হোক, অথবা কুরআনকে কেবল একটি নীতিমূলক গ্রন্থ হিসেবে দেখা হোক, যার নির্দেশগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিলো। এর ফলে কুরআনের পূর্ণতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রবল সন্দেহ বিস্তার করা সম্ভব হবে।

২. বিশ্লেষণে আত্মকেন্দ্রিকতা: যার কারণে আরবি ভাষার প্রকৃতি, এর ব্যাকরণগত কাঠামো, সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট এবং অলংকারশাস্ত্র-সবকিছুকেই উপেক্ষা করা হয়। এমনকি কুরআনের আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার গভীর অর্থ ও তাৎপর্য এবং আধুনিক ভাষাতত্ত্বের, বিশেষ করে শব্দার্থবিদ্যার (semantics) গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহকেও আমলে নেওয়া হচ্ছে না।

৩. ব্যাখ্যার জন্য যথাযথ যোগ্যতার অভাব: কুরআনকে কুরআনের মত নয় বরং অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত, যার পটভূমি ইসলামি বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার সাথে পরিপূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ না।

৪. ইসলামি শাস্ত্রবিদ্যার বর্জন: যেসব জ্ঞানশাস্ত্র-যেমন: সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, এবং অলংকারশাস্ত্র বিষয়ক পড়াশোনা-ধর্মীয় গ্রন্থগুলোকে সংরক্ষণ করতে, সেগুলোর সত্যতা প্রমাণ করতে, এবং সঠিক উপায়ে বুঝতে ও নিয়মকানুন তৈরি করতে সাহায্য করেছে, যার মাধ্যমে ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বিশ্লেষণ পদ্ধতি বা বিজ্ঞানসম্মত, বস্তুনিষ্ঠ ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যার ধারা তৈরি হতে পারত-সেই জ্ঞানগুলোকে এখন পুরোনো ও সেকেলে বলে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছো

ইসলামের নিজস্ব হারমেনিউটিক্স গঠন

একটি সুসংহত বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাকাঠামো তৈরি করা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি। এই কাঠামো আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং কুরআন-সুন্নাহর মূল ভিত্তিগুলোকে সমর্থন করবে এবং সেগুলোর মৌলিক প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করবে। পশ্চিমাদের ক্ষতিকারক জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে আমাদের ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করা অপরিহার্য।

একজন গবেষকের প্রধান যোগ্যতা হলো গবেষণার দক্ষতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমরা এমন অনেক গবেষককে দেখি যারা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বড় বড় প্রশ্নের উত্তর দেন যুৎসই জ্ঞান ছাড়াই, কেবল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে। এই ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক ডাকাতির ক্ষতিকর প্রভাব হয়তো এখনই যেখানে সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার আর কোনো পরিবেশই থাকবে না। তখন বোঝা যাবে না। তবে এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন এক পরিস্থিতিতে পড়বে, সভ্যতা বা সংস্কৃতি নির্বিশেষে সত্যের সন্ধান করাটা কেবলই একটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা বলে গণ্য হবে।

আমাদের আলিমগণ, বিশেষত উসূলীগণ এ বিষয়ে ব্যাপক কাজ করে গিয়েছেন, তাদের সেই কর্মযজ্ঞ থেকে আমরা প্রভূত উপকৃত হতে পারি। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমাদের কাজে লাগবে,

১. ভাষিক মূলনীতি: আধুনিক ভাষাতত্ত্বের (বিশেষ করে শব্দতত্ত্ব) পাশাপাশি আরবি ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, অলংকারশাস্ত্র, ছন্দতত্ত্ব, সমালোচনা এবং অন্যান্য সাহিত্যিক শাস্ত্র নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করা।

২. তাফসীরের মূলনীতি: আলিমগণ কীভাবে কুরআনের অর্থ উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলোর মূলনীতি ও বিধিবিধান গভীরভাবে অনুধাবন করা।

৩. হাদীছশাস্ত্রের মূলনীতি: হাদীসের সনদ (বর্ণনাসূত্র) এবং মতন (মূল ভাষ্য) পরীক্ষা করে সেগুলোর বিশুদ্ধতা ও অন্তর্নিহিত ত্রুটিবিচ্যুতি নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো ভালোভাবে শেখা।

৪. ফিকহের মূলনীতি: ফকীহগণ কীভাবে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধিবিধান তৈরি করতেন; এক্ষেত্রে কোন উৎস, মানদণ্ড, পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করতেন, সে ব্যাপারে সম্যক অবগতি অর্জন করা দরকার। এর সাথে সমসাময়িক আইনের উৎস এবং দর্শন সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা থাকা জ জরুরি।

_________★★★________

ইসলামি নারীবাদের ভ্রান্তি

ইসলামী নারীবাদ সম্পর্কিত কিছু ভ্রান্তি ও সমালোচনার মধ্যে রয়েছে, এটিকে অনেকে ইসলাম-বিরোধী এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব হিসেবে দেখেন, যা ধর্মীয় রীতিনীতির পরিপন্থী। এই তত্ত্বের সমর্থকরা ইসলাম ও পশ্চিমা নারীবাদকে একত্রিত করার চেষ্টা করে, যা ধর্মীয় আলেমদের মতে ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইসলামী নারীবাদীদের কিছু চরমপন্থী ব্যাখ্যা ও দাবির কারণে অনেকে এটিকে 'মৌলবাদী' বা 'চরমপন্থী' বলে মনে করেন, যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমালোচনা করে কিন্তু ইসলামের মূল শিক্ষাকে খর্ব করে।

ভ্রান্তির কারণ

- **ইসলাম ও পশ্চিমা নারীবাদকে এক করা:** ইসলামী নারীবাদীরা ইসলাম ও পশ্চিমা নারীবাদকে একত্রিত করার চেষ্টা করে, যা অনেক আলেমদের মতে একটি ভ্রান্ত ধারণা। এটি ইসলামকে পশ্চিমা ধ্যানধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করার একটি ভুল প্রচেষ্টা বলে মনে করা হয়।
- **ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও আক্ষরিকতা:** কিছু ইসলামী নারীবাদী কুরআন ও হাদিসের আক্ষরিক ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করে, যা অনেক ধর্মীয় পণ্ডিতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এর ফলে এই তত্ত্বকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হিসেবে দেখা হয়।
- **"চরমপন্থী" বা "মৌলবাদী" ধারণা:** কিছু ইসলামী নারীবাদী ব্যাখ্যাকে উগ্র বা চরমপন্থী হিসেবে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, উম্মে সালামা (রা.)-এর ঘটনাগুলোর উদ্দেশ্যমূলক বর্ণনা বা অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিজেদের দাবির সমর্থনে ব্যবহার করা হয়, যা বিতর্ক সৃষ্টি করে।
- **ইসলামের কিছু ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা:** অনেক সময় ইসলামী নারীবাদীরা ইসলামের কিছু ঐতিহ্য যেমন বহুবিবাহ, পর্দা এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুশাসনকে আধুনিকতার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা বা সমালোচনা করে, যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক নয়।
- **পুরুষতান্ত্রিকতার অভিযোগ:** ইসলামকে পুরুষতান্ত্রিক বলে অভিযোগ করা হয় এবং এর থেকে নারীবাদের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। কিন্তু এটি একটি বিতর্কিত বিষয়।

ইসলামী নারীবাদ ও এর সমালোচনা

- **ইসলামের মূল ধারণা থেকে বিচ্যুতি:** ইসলামী নারীবাদীদের অনেকেই ইসলামের মূল ধারণা থেকে বিচ্যুত, যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত।
- **নারীর অধিকারকে বিকৃত করা:** কিছু ইসলামী নারীবাদী নারীর অধিকারের ধারণাকে বিকৃত করে, যা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভুলভাবে উপস্থাপনা করে।
- **ভিন্ন মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা:** ইসলামী নারীবাদীরা প্রায়শই ভিন্ন মতের প্রতি অসহিষ্ণু হয়, যা একটি নেতিবাচক দিক।

ইসলামী নারীবাদ একটি জটিল ও বিতর্কিত বিষয়। এর পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি রয়েছে। এর লক্ষ্য হলো ইসলামি ও আধুনিক সমাজের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা, কিন্তু এর কিছু ব্যাখ্যা বিতর্কিত এবং ধর্মীয় আলেমদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আমার দৃষ্টিতে, ইসলাম ও নারীবাদের মধ্যে সমন্বয় অনেক দূরবর্তী ও কঠিন এক ধারণা। কারণ, দার্শনিকভাবে এরা দুজন দু'প্রান্তে কিংবা বিপরীতমুখী দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে। এই কারণেই "ইসলামি নারীবাদ" বা "নারীবাদী ইসলাম"-এই ধরনের শব্দযুগলকে আমি সঠিক বলে মানি না। নারীবাদ হচ্ছে একটা মানবসৃষ্ট মতবাদ, যেখানে চিন্তা ও যুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গড়া হয়।

অন্যদিকে, ইসলামের দাবি ভিন্ন। মুসলিমদের কাছে ইসলাম একটা ঐশী ধর্ম বা দ্বীন-যা কেবল বিশ্বাস নয়, বরং একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মতবাদ ও দ্বীন-এ দুই শব্দের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। মতবাদ গড়ে ওঠে মানুষের যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ওপর, সেখানে ঐশী প্রত্যাদেশকে মৌলিক গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু দ্বীন বা ধর্ম, অর্থাৎ, ইসলাম মৌলিকভাবে মানবীয় বুদ্ধির ফল না, এখানে মূল গুরুত্ব ঐশী প্রত্যাদেশের। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের ওপর অবতীর্ণ এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সমাধান বাতলে দেয়।

এই প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে গেলে, "ইসলামি নারীবাদ" বা "নারীবাদী ইসলাম" ধরনের পরিভাষা একেবারেই ভুল। এসব শব্দে যেন ঐশী বিধান ও মানবিক মতবাদকে একই স্তরে ফেলে দেওয়া হয়-যা ইসলামের মৌলিকতাকে আঘাত করে। এই ধরনের প্রচেষ্টা ধর্মকে দুর্বল করে, এবং মূলত এটি একপ্রকার ধার্মিক ও মতবাদী বিভ্রান্তি।

সবকিছুকে যদি প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় মূল্যায়ন করতে থাকি, তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি বিধান-যেগুলোকে ছাওয়াবিত বলা হয়-সেগুলোকেও একসময় পরিবর্তন করতে হতে পারে। আর এই ধারা দীর্ঘমেয়াদে ধর্মের একপ্রকার বিনির্মাণ (deconstruction) ঘটাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-"**আমি তোমার আগে কেবল পুরুষদেরই রাসূল করে পাঠিয়েছি।**"

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো-নবুওয়্যাত বা রিসালাত কোন লিঙ্গকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার বিষয় না। বরং এটা একান্তই আল্লাহ-নির্ধারিত বিষয়। তাই এতে বিকল্প ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা মূলনীতির পরিপন্থী-দুটি কারণে,

ক. নবী বা রাসূল নির্বাচনের ক্ষমতা আলিমদের নয়। এটা আল্লাহর একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষের কোনো দ্বিমত গ্রহণযোগ্য না।

খ. এই সিদ্ধান্ত নারী-পুরুষের মাঝে সমতার ভিত্তিকে প্রভাবিত করে না। কারণ পূর্ণ সমতা বাস্তবে কখনোই সম্ভব নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আমরা সমতার সীমাবদ্ধতা দেখি।

কুরআনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মূলভিত্তি হলো ন্যায্যতা (Justice); এই ন্যায্যতা-ই তাঁদের পারস্পরিক সম্মান, মর্যাদা ও সুখ-শান্তির ক্ষেত্রে আদর্শ মডেল। কুরআন আধুনিক পাশ্চাত্যের মত লিঙ্গসমতার কথা বলেনি, কেন? এর কারণ, কুরআন মানুষের

মূল্যায়নে লিঙ্গকে মুখ্য করে না। নারী বা পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে কুরআন সম্বোধন করেছে 'ইনসান' হিসেবে।

এই ইনসানই আল্লাহর দাস এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি-খলিফা। অর্থাৎ,**মানব পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু হলো ঈমান ও তাকওয়া,লিঙ্গ নয়।**

এই ঐশী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই নারী ও পুরুষের সম্পর্ককে বোঝা যায়-চিন্তা ও আচার-আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই। কুরআন পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই পথনির্দেশনা দিয়েছে, কীভাবে তারা জীবন পরিচালনা করবে, কীভাবে জীবনের প্রতিটি স্তরে চলবে। কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণ এবং সর্বজনীন। এতে আধ্যাত্মিক, অধিবিদ্যক ও বাহ্যিক সব দিকই অন্তর্ভুক্ত আছে। আত্মিক ও নেতিক অবস্থানে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান মর্যাদা রাখে। আমল, ইবাদাত এবং আল্লাহর দরবারে পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য ও বিচাজন নেই।

তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে কুরআন নারী ও পুরুষকে বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক হিসেবে দেখেছে। নারীর প্রধান দায়িত্ব হিসেবে পরিবার পরিচালনা ও সন্তানের তত্ত্বাবধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, আবার পুরুষের ওপর অর্পিত হয়েছে পরিবারের আর্থিক ব্যয়ভার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। কিন্তু এর মানে এই না যে নারীদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। বরং নারীও স্বতন্ত্রভাবে সম্পত্তির মালিক হতে পারে, উপার্জন করতে পারে এবং আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

ইসলাম সবসময় পরিবারকে সমাজের কেন্দ্রীয় ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। আধুনিকতার ঢেউ আঁছড়ে পড়ার আগ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে এই পারিবারিক ভারসাম্য, দায়িত্ববোধ ও সম্মানবোধ ছিল স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। কুরআনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, একে অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত নিরন্তর সংগ্রামও নয়; বরং একধরনের ভারসাম্যপূর্ণ সহযোগিতা, যেখানে প্রতিটি পক্ষের অধিকার, দায়িত্ব ও মর্যাদা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত।

কুরআনভিত্তিক বা ইসলামি পরিবারব্যবস্থা একটি সর্বজনীন ও মানবপ্রকৃতি-সম্মত জীবনব্যবস্থা। কারণ এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, চাহিদা ও মঙ্গলকে ভিত্তি করেই গঠিত। এই ব্যবস্থাই পারে মানুষের প্রকৃত সুখ, পারস্পরিক সংহতি, সৌহার্দ্য এবং জীবনের ভারসাম্য নিশ্চিত করতে-যা আজকের প্রচণ্ড অস্থির ও মূল্যবোধ-ভ্রষ্ট সময়ে একান্ত জরুরি হয়ে গিয়েছে। যখন নারী ও পুরুষের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে, তখন প্রথাসম্মত ও নৈতিক মূল্যবোধকে পুনরায় জাগ্রত করাই আমাদের সময়ের দাবি।

_________★★★_________

লিঙ্গরুপান্তরবাদ ও আমাদের স্বর্গীয় প্রকৃতির লঙ্ঘন

উস্তায হাসান স্পাইকার

“তাঁর "তাঁর নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাঁদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর ভেতরে নিদর্শন আছে সেসব লোকের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে। "'সুরা রুম, আয়াত: ২১

"এবং পুরুষরা নারীদের মত নয়”।*সুরা নিসা, আয়াত: ৩৬

সৃষ্টির নিয়মে মানুষ সহজাতভাবেই এই দ্বৈত অধিবিদ্যক নীতির মূর্তপ্রতীক। তাকে হয় পুরুষ আর নাহয় নারী হতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে এর যেকোনো একটি করেই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। কেউ নারী হবে না পুরুষ-এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। আমি পুরুষ হব বা নারী হব-এমনটা মানুষ বলতে পারে না। এর অর্থ দাঁড়ায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে গেলে, মানবীয় সেই মর্যাদার অধিকারী হতে গেলে আমাদের সেই নির্দিষ্ট ভূমিকাকে-নারী আর নাহয় পুরুষ-যথার্থতা ও ইহসানের (অনুপুঙ্খ সৌন্দর্যের) সাথে পালন করতে হবে, যে-ই ভূমিকা ঐশ্বরিকভাবে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

এই যুগে মানুষের লিঙ্গধারণার অধিবিদ্যক (metaphysical) ও পরাতাত্ত্বিক (ontological) অবস্থান স্পষ্টভাষায়, পরিষ্কার করে বর্ণনা করাটা আশু দরকার হয়ে পড়েছে। এই আধুনিক যুগের একান্ত প্রয়োজন এটা। কেননা লিঙ্গের ধারণার ওপর কোনো প্রকার আক্রমণ স্বয়ং মানবস্বভাব ও মানবীয় মর্যাদার ওপর আক্রমণ, যে-ই আক্রমণ বর্তমানে স্বাধীনতা ও আত্মনির্ধারণের নামে অহরহ করা হচ্ছে। যার কারণে আমরা দেখতে পাই লিঙ্গধারণা সামাজিকভাবে নির্মিত এক অন্ধপ্রথা মাত্র এই কথা বহুলমাত্রায় প্রচলিত হয়ে গেছে, এমনকি শিক্ষাব্যবস্থায়ও তোতাপাখির মত এই কথা কোমলমতিদেরকে আওড়াতে শেখানো হচ্ছে। আপেক্ষিকতাবাদ (Relativism) ও বিশৃঙ্খল স্বাধীনতার ধারণা ছাড়া আর কোনো শক্তপোক্ত দার্শনিক ভিত্তি এর পেছনে নেই। কিন্তু এই নব্য ধারণা কি আসলেই এমন কোনো পবিত্র রহস্য যাকে মানুষের হাজার হাজার বছরের সামষ্টিক অভিজ্ঞতার অর্থাৎ, মানব শরীরি-গঠনতন্ত্রের (anatomy)-ওপর প্রাধান্য দিতে হবে?)

ইসলাম মতে লিঙ্গ মানুষের পাশবিক বৃত্তি ও স্বর্গীয় প্রকৃতি উভয় থেকে উদ্ভূত। দ্বিলৈঙ্গিক মূলনীতি অর্থাৎ, নারী ও পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য কেবল সৃজনী ভালোবাসা তথা কেবল সন্তান উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নারী ও পুরুষের আপাত বিপরীত তবে পরিপূরক গুণ ও যোগ্যতার মাধ্যমে জগতের নির্মাণ করাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

লিঙ্গ স্রেফ স্বতন্ত্র শারীরিক চিহ্নই না, এর সাথে আলাদা রকমের মানবীয় গুণ ও সম্ভাবনাও যুক্ত। এর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে পৃথিবীতে আল্লাহর যথার্থ প্রতিনিধি হতে পারে। নারী ও পুরুষ

উভয়েই দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন তখনই সম্ভব যখন ভারসাম্য ও প্রতিসাম্যতা বজায় থাকবে, আর তা সম্ভব নারী ও পুরুষদের বিপরীত গুণসমূহের সুষ্ঠু মেলবন্ধনের মাধ্যমে। মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক আদুদুদ্দিন আল ইজি লিখছেন,

মানুষ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা হলো মানুষ যাতে রব্বানী বা ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, যেমনটা কুরআনের 'আমি দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি' এই আয়াতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া 'আমি গোটা আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল ও তাতে শঙ্কিত হলো। মানুষ তা বহন করল আয়াতের মর্মার্থও এমনই। একমাত্র মানুষকেই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দেওয়ার কারণ মানুষই একমাত্র সৃষ্টি যে একই সাথে বিপরীত গুণ ধারণ করতে এবং ইহজগত ও আধ্যাত্মিক জগতের নির্মাণ করে একে বাসযোগ্য বানাতে সক্ষম।

তিনি লিঙ্গধারণাকে মাথায় রেখে এই লেখা লেখেননি, তবে তা লিঙ্গধারণার অধিবিদ্যক ভিত্তি ও আল্লাহপ্রদত্ত মানবীয় প্রতিনিধিত্বের আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে এক চমৎকার ও অকাট্য সত্য আমাদের সামনে তুলে ধরে। তবে পাশ্চাত্যে চার্লস ডারউইন, কার্ল মার্ক্স, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের হাত ধরে মানুষ ও সমাজের ব্যাপারে যে সকল চিন্তার উদগীরণ হয়েছে তা মূলত জড়বাদী প্রকৃতির।

ঐতিহ্যগত ধ্যানধারণা যেহেতু ধর্মতত্ত্বাশ্রিত ছিল তাই নিরীশ্বরবাদী জগতে এসব ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্তি লাভও একান্ত দরকারী। এর আদর্শ ও চূড়ান্ত বয়ানটি আমরা পাই জ্যা পল সার্তে থেকে, যিনি মানবস্বভাবকে (human nature) একেবারে উড়িয়ে দিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছেন 'অস্তিত্ব সারসত্তা-এর চাইতে অগ্রগামী (প্রাধান্যযোগ্য)।' তার ভাষায়,

অস্তিত্ব সারসত্তা-এর চাইতে অগ্রগামী (প্রাধান্যযোগ্য)-এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য হলো-মানুষ প্রথমে অস্তিত্ব লাভকরে, নিজেকে আবিষ্কার করে, পৃথিবীতে প্রবেশ করে, এরপরে গিয়ে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে। অস্তিত্ববাদীদের দৃষ্টিতে মানুষকে সংজ্ঞায়িত করা না যায়, তবে তার কারণ হলো শুরুতে সে কিছুই নয়। সে পরে যা হবে, তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজের সৃষ্টি। সুতরাং, মানব স্বভাব-প্রকৃতি বলে কিছু নেই, কেননা মানবস্বভাবের ধারণার জন্য প্রয়োজনীয় সেই ঈশ্বর-ই তো নেই।' মানুষ অস্তিত্বশীল। সে আছে, ব্যস আছে, এর বাহিরে আর কিছু না। তার মানে এই না যে মানুষ নিজের ব্যাপারে যা ভাবে সে তা, বরং সে তা-ই যা সে ইচ্ছা করে, সে তো অস্তিত্ব লাভের পরেই নিজের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে পারে। এরপরে সে যেমনটা হতে চায় তা-ই বা তেমনটা-ই পরিণত হয়। মানুষ নিজেকে যেমনটা নির্মাণ করে-এ ছাড়া সে আর কিচ্ছুটি নয়।

সাত্রের আধ্যাত্মিক গুরু মার্ক্স আগেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে গিয়েছেন,

"মানব সারসত্তা (essence) এক আকাশকুসুম কল্পনা, এর কোনো প্রকৃত বাস্তবতা নেই।"২
কেননা,
"মানুষ জগতের বাহিরে বসবাসকারী কোনো বিমূর্ত সত্তা না। মানুষই মানুষের জগৎ, রাষ্ট্র ও সমাজ।"
মার্ক্সের কাছে মৌল মানবস্বভাব (human nature) বলতে কিছু হয় না। যাকে মানবস্বভাব বলা হয় তা আসলে,

"ঐতিহাসিকভাবে মানব-অবস্থার নির্দিষ্ট কিছু রূপ মাত্র; অর্থাৎ, সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদ কিংবা সাম্যবাদ-প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা মানব-প্রকৃতির ধারণা বিদ্যমান। মানুষের আসল প্রকৃতি হলো সমস্ত সামাজিক সম্পর্কনিচয়ের একটা সমষ্টি মাত্র।"

স্বাভাবিকভাবেই মার্ক্স লিঙ্গকে একটি গতিশীল ধারণা হিসেবে দেখতেন, ভবিষ্যতে যার আরও বিকাশের সম্ভাবনা আছে। মানে লিঙ্গ নির্দিষ্ট কিংবা স্থির কোনো কিছু না, এর মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করা সম্ভব।
কেননা,
"প্রকৃতি ও সমাজ কোনো কিছুই স্থির না। ইতিহাস-মুক্ত, ইতিহাস-অতীত 'প্রাকৃতিক' বলতে কোনো কিছু নেই। 'প্রাকৃতিক' নামের প্রত্যয় সম্ভব-শুধু নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই, অন্য কোনোভাবে না।"

মার্ক্সের মতানুসারে খোদ মানব-প্রকৃতি বলতেই যদি কিছু না থাকে তবে এর অধীনস্থ অন্যান্য প্রকারাত্মতা (modality) যেমন-লিঙ্গও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ঠিক এমনটাই দেখা যাচ্ছে বর্তমানে। লিঙ্গের মত মানব অস্তিত্বের মর্মমূলের সাথে এতটা নিবিড়ভাবে জড়িত একটা বিষয়কেও এখন আপেক্ষিক, দৃষ্টিভঙ্গিজাত, তরল, অন্যায়ের হাতিয়ার এমনকি আগাগোড়া কাল্পনিক বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

লিঙ্গ-তারল্যের অগ্রদূত

১৯৯০ সালে জুডিথ বাটলার রচিত" Gender Trouble" বই যদি হয় পূর্ণবৃক্ষ, তবে সাত্রের প্রেমিকা সিমন দ্যু বোভিয়ারের "The Second Sex" বইটি ছিল তার বীজ। দমনমূলক লিবারেলিজম আরোপ, মানবস্বভাব ও লিঙ্গদ্বয়ের পরিপূরকতার অস্বীকৃতি ছিল এ বইয়ের মূল উপজীব্য। দ্যু বোভিয়ার ভূমিকায় যা বলেছেন তাকে গোটা বইয়ের সারসংক্ষেপ বলা যায়,

নারীত্ব-এটা কি ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত? নাকি তা প্লেটোর মানমন্দিরে সংরক্ষিত কোনো দার্শনিক সারবস্তু? যদিও কিছু নারী একে (অর্থাৎ, নারীত্বকে) ঈর্ষার সাথে প্রতিমূর্ত করার চেষ্টা

করে তবে তা পরম নিশ্চিত কিছু না। নারীত্বকে সাধারণত অস্পষ্ট ও রহস্যময় শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। সেন্ট থমাসের সময়ে একে নিশ্চয়তার সাথে সারবস্তু (essence) হিসেবে দেখা হতো, অনেকটা আফিম গাছের চেতনাহারী গুণের মতই তা নিশ্চিত (অর্থাৎ, আফিমের মধ্যে যেমন চেতনাহারী স্বভাব দ্রব্যগুণের মত সহজাতভাবেই বিদ্যমান একইভাবে নারীত্বও বুঝি নারীসত্তার মধ্যে সহজাতভাবেই বিদ্যমান)। কিন্তু ধারণাবাদের (conceptualism) পূর্বেকার দৃঢ় অবস্থান এখন আর নেই। জীববিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান এখন আর বিশ্বাস করে না বস্তুর চিরস্থায়ী অপরিবর্তনীয় কোনো বৈশিষ্ট্যে। যেমনঃ নারী মানেই নারীত্ব, ইহুদী মানেই ইহুদীত কিংবা কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব—এমন কোনো কিছুর ওপরই আধুনিক সময়ে এসে বিশ্বাস রাখা যায় না। অধুনা বিজ্ঞানের মতে বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি-অনুগামী বিশেষ প্রতিক্রিয়া। যদি আজকে এসে মনে হয় নারীত্ব নামে কোনো জিনিস নেই, তবে তা এই কারণে যে, তা আসলে কোনোদিনই ছিল না।

সিমন দ্যু বোভিয়ার 'পুরুষ' ও 'নারী' বাদে অন্য কোনো লিঙ্গের সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেননি। তবে তিনি খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন এগুলো সবই ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত ধারণা মাত্র, যার থেকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দ্বৈত লিঙ্গ-ব্যবস্থার কোনো সাত্ত্বিক প্রয়োজন আদতে নেই।।

নারীবাদী তত্ত্ববিদ নাটালিয়া স্তোলজারের মতে,
"নামসর্বস্বতাবাদ (nominalism) নারীবাদীদের মধ্যে অধিকতর জনপ্রিয়, বাস্তবসর্বস্বতাবাদকে (realism) তারা সাধারণত অস্বীকার করে।

_________★★★_______

লিঙ্গ ভারসাম্য: আল্লাহর পরিকল্পনার প্রতি আত্মসমর্পণ

সঠিক ফ্রেমওয়ার্ক

ইদানীংকালে লিঙ্গ এবং এ সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের আলোচনাগুলো বিভ্রান্তি এবং ভুল বোঝাবুঝিতে পরিপূর্ণ; এই বিষয়টি আমরা অস্বীকার করতে পারব না। মোটাদাগে এর মূল কারণ হলো, বিপরীত বিশ্বদর্শন: ইসলাম এবং সেক্যুলার লিবারেলিজম/(১০০)। ইয়াকিন ইন্সটিটিউট এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে,

'সামসময়িক আন্দোলনগুলোর আদর্শিক ভিত্তি অনেকাংশেই ইসলামি শরিআহর সাথে সাংঘর্ষিক। আর দুঃখজনকভাবে তরুণ প্রজন্ম এ বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়। তারা এসবের দিকে আকৃষ্ট হয় ক্ষমতায়নের লোভে।

বর্তমানে নারীবাদ এবং লিঙ্গ-সমতার মতো সেক্যুলার মতাদর্শগুলো মুসলিম তরুণদের মধ্যে এত মারাত্মকভাবে প্রবেশ করেছে যে, বেশিরভাগ তরুণই এসব ফ্রেইমওয়ার্কের বাইরে থেকে বিষয়গুলো চিন্তা করতে পারে না। অমুসলিমদের মতো আমরা মুসলিমরাও আজ পশ্চিমের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে বস্তুনিষ্ঠ সত্যের প্রশ্নাতীত উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছি। সেখানকার অধ্যাপকরা সত্যের দিশারি, জ্ঞানের আধার হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেকে বৈরাগ্যবাদী (Stoic) হিসেবে প্রশংসিত হয়, আবার কিছু ব্যক্তি সামাজিক ন্যায়বিচারের মূর্তপ্রতীক হয়ে ওঠে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যে সেক্যুলার দর্শন এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত তা আমরা বুঝতে ব্যর্থ হই। পশ্চিমা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা যা গলাধঃকরণ করি তার বেশিরভাগই হলো এক ঈশ্বরহীন সমাজব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু অংশবিশেষ।

বর্তমানে ওহি মানা ঐচ্ছিক হয়ে উঠেছে। ইচ্ছা হলো মানলাম, ইচ্ছা হলো না হানলাম না। আর এভাবে কখনই ন্যায়বিচার, ভারসাম্য, শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। যেমনটা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন:

'নিশ্চয় আমরা লাঞ্ছিত ছিলাম এবং আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ আমাদের যা দিয়ে সম্মানিত করেছেন তা ব্যতীত আমরা যদি অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মানিত হতে চাই, তবে আল্লাহ আমাদের লাঞ্ছিত করবেন। ১৮০]

Catch-২২

উম্মাহর ভাই-বোনদের সবার নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। আর এটাই হলো জেন্ডার ডাইনামিক্সের একমাত্র সমাধান। অর্থাৎ, আমরা যে আল্লাহর আদেশকে লঙ্ঘন করছি তা উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই সাথে নিজেদের সংশোধন করতে হবে। 'আগে পুরুষদের নিজেকে পরিবর্তন করা উচিত'-এই দাবিকে আমি বিশ্বাস করি না। এটি একটি অসাড় দাবি এবং এটি ইসলামি নীতিমালার বিরুদ্ধে যায়। সামনে বিষয়টি আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব। তবে এটা সন্দেহাতীত সত্য যে পুরুষরা যদি তাদের দায়িত্ব যথারীতি পালন না করে; তবে

নারী-পুরুষ কেউই ন্যায়বিচার,ভারসাম্য, শৃঙ্খলা এবং শান্তির আশা করতে পারবে না। আল্লাহ এ বলেন,

'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' [সুরা আর-রাদ: **১১**]

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পরিবার ধ্বংসের পেছনে সেক্যুলার মতাদর্শগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেবল নারীরাই বিবাহবিচ্ছেদ কিংবা পারিবারিক কলহের জন্য দায়ী-এমন দাবিও একইসাথে মিথ্যা এবং অন্যায়। আশা করা যায় এ প্রবন্ধ থেকে এটুকু স্পষ্ট হবে যে, নারী-পুরুষ উভয়েই যখন নিজেদের ফিতরাতকে শ্রদ্ধা করতে এবং আপন করে নিতে শিখবে কেবল তখনই ন্যায়, শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

_________★★★________

স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি আত্মসমর্পণ

শৈশব থেকেই আমরা মহাবিশ্বে নিজেদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করি। শিশুর জীবনে বড়দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি হলো শিশুটিকে সত্যের দিকে পরিচালিত হতে সাহায্য করা। তার সহজাত প্রবণতায় হস্তক্ষেপ না করে তাকে প্রস্তবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আবু হুরায়রা রা. আল্লাহর রাসুল ও হতে হানা করেছেন: 'প্রতিটি মানুষ মায়ের পেট থেকে পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা জাদুকর বানায়। তারা উভয়েই যদি মুসলিম হতো তবে সেও মুসলিম হতো। (১৮১)

প্রতিটি মানুষকেই মুসলিম এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়। অথাৎ, আমাদের প্রাকৃতিক প্রবণতা হলো আল্লাহর আনুগত্য করা। তাঁর সমস্ত সৃষ্টি যে ভারসাম্যপূর্ণ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ তা উপলব্ধি করা। একটু থামুন। ভাবুন, 'আনুগত্য' বলতে আমরা কি বুঝি। আল্লাহর বান্দা হওয়ার অর্থ আসলে কী? আনুগত্য হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি এবং প্রজ্ঞায় যে পরিকল্পনা করেন মানুষের পক্ষে সেটার রহস্য পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়। যদিও আমাদের পক্ষে পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তবুও আমাদের মানতে হবে যে আল্লাহর পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। আমাদের সচেতন থাকতে হবে আমরা যেন এ ভারসাম্যে হস্তক্ষেপ না করি। নয়তো আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর ধ্বংস ডেকে আনব।

আল্লাহ ও সুরা আর-রাহমানে বলেন,

'সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী। তৃণলতা গাছপালা তাঁরই জন্য সিজদায় অবনত। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত, আর স্থাপন করেছেন ন্যায়ের মানদণ্ড। যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না করো। আর তোমরা ন্যায়সংগতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজনকৃত বস্তু কম দিয়ো না।' [সুরা আর-রাহমান: ০৫-০৯]

আমাদের সহজাত প্রবণতা এমন যে, আমরা সবকিছুর ভারসাম্য অনুধাবন করা ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে সতর্ক হব। স্রষ্টাপ্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আমাদেরকে 'ইবাদ তথা আল্লাহর বান্দা হওয়ার অর্থ বুঝতে সাহায্য করবে এবং আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। আবার এ ইচ্ছাশক্তিই আমাদেরকে ধ্বংসের পথেও পরিচালিত করতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে, আল্লাহ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার সুরক্ষার ব্যবস্থাও করে নিয়েছেন। অর্থাৎ, তিনি এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, যখন আমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হই তখন তা আমাদেরকে সংশোধন করে দেবে। আল-আদল ন্যায়বিচারক) আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ন্যায়ের প্রবণতা দিয়ে তৈরি করেছেন। তিনি আল-মুকসিত ঔঁ (সাম্য প্রতিষ্ঠাকারী) আমাদের জন্য ঐশ্বরিক বাণী কুরআন প্রেরণ করেছেন। পাশাপাশি একজন নিখুঁত মানুষের জীবন্ত

উদাহরণ প্রদান করেছেন যাতে আমরা আমাদের এ অস্থায়ী দুনিয়ায় সঠিক নির্দেশনা পেতে পারি। যখন আমরা ভুল করতে শুরু করি তখন আমরা বিভিন্ন উপায়ে কল্যাণ, সত্য এবং আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার দিকে পরিচালিত হই, যা সহজাতভাবে ন্যায়সংগত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। আমরা এই রিমাইন্ডারগুলো গুরুত্বের সাথে নিতে পারি বা উপেক্ষা করতে পারি। যখন আমরা উপেক্ষা করাকে নিই তখন আমরা মূলত নিজেদের এবং অন্যদের ওপর অবিচার করি।

যদি আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, আল্লাহর আদেশ অমান্য করার অর্থ মূলত ভারসাম্য এবং শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যাওয়া, তবে আমরা বুঝব যে পাপ নিজেই একটি বিশৃঙ্খলা এবং এটিই মূলত অন্যায়-অবিচারের কারণ। আরবিতে অন্যায়-অবিচার

বুঝাতে ظلم)জুলুম) শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যা আমরা নিজেদের পাশাপাশি অন্যদের ওপরও চাপিয়ে দিতে পারি।

চলুন এমন একটি উদাহরণ দেখি...!

'হায়া' মোটাদাগে এর অর্থ হলো, লজ্জা বা বিনয়। এ শব্দের বাংলা অনুবাদে এর গুরুত্ব কমে যায়। 'হায়া' হলো একটি জটিল এবং সূক্ষ্ম মানবীয় গুণ যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবুও আমাদের বোঝা উচিত যে, 'হায়া' হলো এক সহজাত এবং অর্জিত সুরক্ষা কৌশল, যা আল্লাহ আমাদের সকলকে দান করেছেন। 'আল্লাহ এ গুণকে বিশেষভাবে মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যেন তারা তাদের কামনার বশবর্তী হয়ে পাপ কাজে সহজে জড়িয়ে না পড়ে। তারা যেন বন্য পশুর 'হায়া' আমাদের স্বাধীন মতো নির্লজ্জ হয়ে পাপ কাজে ঝাপিয়ে না পড়ে/০/১২৯৩) ইচ্ছাকে আমাদের ক্ষতির জন্য ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে। 'হায়া' আমাদের পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম অমান্য করাই কি পাপ নয়?

'হায়া' বা লজ্জাশীলতা একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য হওয়ায় এটি আমাদের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। ফিতরাতের বেশিরভাগই নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সর্বজনীন। যেমন, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস একটি সার্বজনীন সহজাত বৈশিষ্ট্য। যদিও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা কিংবা আশপাশের অন্যান্যদের (যাদের প্রত্যেকেই স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী) সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়ে আমরা সত্য থেকে দূরে সরে যাই বা বিপথগামী হয়ে পড়ি। একইসাথে লিঙ্গ-কেন্দ্রিক প্রবণতাও ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

'আর পুরুষেরা নারীর মতো নয়।' [সুরা আলে-ইমরান: ৩৬]

অসংখ্য আয়াত এবং হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, লিঙ্গের অস্তিত্ব জৈবিকভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে বাস্তব। ইসলাম নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের ব্যক্তিদেরকে তাদের পোশাক, যোগাযোগ, আচরণে গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়।

নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই 'হায়া' একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু লিঙ্গ ভেদে 'হায়া' ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। তাই আল্লাহ ও পুরুষ ও নারী উভয়কেই তাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট ফিতরার জন্য ব্যাবহারিক সুরক্ষা প্রদান করেছেন। আল্লাহ এ তাঁর রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'হে নবী, আপনি আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' [সুবা আহযাব: ৫৯]
আমাদের হিজাবকে পশ্চিমা-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন করা বন্ধ করতে হবে। বরং হিজাবের আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। হিজাব হায়ার রক্ষক। এটা মহান রবের পক্ষ থেকে নির্দেশিত একটি সুরক্ষাব্যবস্থা যা আমাদের শালীনতা নিশ্চিত করে। একটি বিখ্যাত হাদিসে বর্ণিত আছে,
'রাসুল আমাদের সিল্ক, দিবাজ, কাসিয়ি এবং ইস্তাবরাক (বিভিন্ন ধরনের রেশমের পোশাক) পরিধান করতে বা লাল মায়াসির (রেশমের বালিশ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। ১৮৯।

সিল্কের নিষেধাজ্ঞা কেবল পুরুষের জন্য প্রযোজ্য, কারণ এটি মূলত মেয়েদের সাজ। একই কারণে মুসলিম পুরুষদের সোনার গহনা পরতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর রাসুল এমন পুরুষদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা নারীদের অনুকরণ করে এবং এমন নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষদের অনুকরণ করে। [১৮৭]
নারীর অনুকরণ করল। রাসুল * এমন ব্যক্তিকে অভিশপ্ত বলেছেন, 'আল্লাহ যাকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে নিজেকে মেয়েলি সাজে সজ্জিত করল এবং করল। ১৮৮] ইনশাআল্লাহ, 'হায়া'র বিষয়টি পরবর্তী প্রবন্ধগুলোয় আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। আপাতত, আসুন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি যে আমাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট প্রবণতাগুলো আমাদের সৃষ্টিকর্তাপ্রদত্ত কার্যকরী এবং ব্যাবহারিক সুরক্ষাব্যবস্থা।
স্বভাবতই শিশুরা আল্লাহর আনুগত্য করে। শিশুরা আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে তাদের মধ্যকার সহজাত প্রবণতাকে বাধা দেয় না। শিশুরা যখন বেড়ে ওঠে এবং চারপাশ সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে; তখন তাদের ফিতরাহ অদৃশ্য হয়ে যায় না। কিন্তু এ প্রবণতাকে সক্রিয় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এমন সব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একে শানিত করতে হবে, যা তার জন্মগত সত্যকে দৃঢ় করবে।
যেহেতু আমাদের স্বাভাবিক স্বভাব বা ফিতরাহ শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে সহজে দেখা যায়, তাই আমরা তাদের মধ্যে সার্বজনীন মানবীয় গুণাবলিকে দেখি। এগুলো আমাদের সহজাত গুণাবলি এবং এগুলো সকল কিছুর প্রাকৃতিক নিয়মের
ন্যায়পরায়ণতা (সকল ক্ষেত্রে সততা);
-পারস্পরিক শ্রদ্ধা (অন্যের জন্য সেটাই চাওয়া যা আপনি নিজের জন্য চান);
সহানুভূতি (অন্যের আনন্দ এবং কষ্টের মধ্যে নিজের আনন্দ এবং কষ্ট দেখা)।

একটি বাচ্চা যখন বড় হতে থাকে তখন সে পরিশীলিত উপায়ে শিখে যে সবকিছুতে সে তার পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন করার অধিকার রাখে। সে শিখে যে নিয়ম ভাঙা যায়। সে বুঝতে পারে তার স্বাধীন ইচ্ছা তাকে অবাধ্য হওয়ার পাশাপাশি আনুগত্য করারও সুযোগ করে দেয়। আর এ কারণেই আমাদেরকে ক্রমাগত তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আমাদের স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি কুরআন এবং নবী-রাসুলগণের মাধ্যমে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন যাতে করে আমরা সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হতে পারি।

সুতরাং যখন আমরা নিজেকে প্রশ্ন করি 'আনুগত্য' বলতে কি বুঝায় এবং গভীরভাবে চিন্তা করি আমরা কীভাবে আল্লাহর 'বান্দা' হলাম; তখন আমরা উপলব্ধি করি আত্মসমর্পণের এক অদৃশ্য শৃঙ্খল, যা আল্লাহর তৈরি নিখুঁত নকশার সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। যখন আমরা আল্লাহর আদেশের কাছে নিজেকে সমর্পণ করি; তখন মূলত আমরা আমাদের ফিতরাহর (সহজাত প্রবৃত্তিরই) অনুসরণ করি। এবং ভালো কাজ করার মাধ্যমে এর মর্যাদা ধরে রাখার চেষ্টা করি; তখনই আমাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটে। এসব গুণাবলি আমরা যে সত্য নিয়ে জন্মেছি তাকে আরও শক্তিশালী করে। ফলস্বরূপ একটি ন্যায়সংগত, সুসংহত এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরির পথ খুলে যায়।

আমাদের বোঝা উচিত যে, আল্লাহর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করার অর্থ হলো, প্রতিটি কাজে সততার অনুশীলন করা। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহমর্মিতা লালন করা। আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা রাখা। অপরদিকে, আল্লাহর অবাধ্যতা আমাদের অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়, মানবীয় গুণাবলির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলস্বরূপ আমরা সুসংগঠিত এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ব্যর্থ হই। আল্লাহ এ আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারা বোবা ও বধির, অন্ধকারের বাসিন্দা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'

[সুরা আল-আনআম: ৩৯]

তিনি আরও বলেন,

'তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছ।'

[সুরা আর-রুম: ২০]

এইভাবে, যখন আমরা আল্লাহর ৩% নকশার স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে যাই, আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার আদেশ লঙ্ঘন করি, এর অর্থ হলো তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা, সমবেদনা, ভালোবাসা, সহানুভূতি অনুশীলন থেকে নিজেদেরকে অক্ষম করে তুলছি। আমাদের অন্তর থেকে এগুলো আর আসবে না। এ মানবীয় মূল্যবোধ এবং গুণাবলি সৃষ্টির শুরু থেকেই নারী-পুরুষ উভয়েই চর্চা করে আসছে। এগুলো স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় যখন নারী-পুরুষ উভয়েই তাদের ফিতরাতকে সম্মান করে। এভাবেই উভয় লিঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য অর্জিত হয়।

'অতএব আপনি উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করুন করুন।'
[সুরা আল-মাআরিজ: ০৫]

ইসলামের বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমান লিঙ্গ-বিষয়ক আলোচনাকে এভাবে দেখলে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ আমাদের এমন সমালোচনার মুখে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুন। কারণ একমাত্র তিনিই সবকিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত রাসুলকে তাঁর নিজের রক্তের আত্মীয়স্বজনরা অপমান করেছে, হেয় করেছে, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমরা যেন অপমান, অপবাদ এবং সমালোচনায় খুব সহজে হাল ছেড়ে না দিই, হতাশ না হয়ে পড়ি। আমাদের সবসময় সত্য বলার এবং বাকি সবকিছু আল্লাহর এ সিদ্ধান্তের ওপর ন্যাস্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে,
'আর আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করো। তা ছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা করো, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' [সুরা আল-আনফাল: ৪৬]
আল্লাহ আমাদের একে অপরকে সৎ উপদেশ দেওয়ার তাওফিক দান করুন। প্রমরা যেন ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে একে অপরের নামে মিথ্যা প্ররোচনা করা থেকে বিরত থাকতে পারি। আমরা যেন একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক হতে পারি সেই তাওফিক দান করুন।
পরিশেষে, আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা চাইলেই সবার অন্তর পরিবর্তন করতে পারব না। আল্লাহ বলেন,
'নিশ্চয় আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে আপনি হিদায়াত দিতে পারবেন না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনিই ভালো জানেন।' [সুরা আল-কাসাস : ৫৬]
এবং তিনি আরও বলেন,'তাদেরকে সৎপথে আনার দায়িত্ব আপনার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।' [সুরা আল-বাকারা: ২৭২]
পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল -ও প্রত্যেকের অন্তর পরিবর্তন করতে পারেননি।
'অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন। কারণ আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।' [সুরা আর-কম: ৬০]

________★★★_______

নারী,সংস্কৃতি ও ইসলাম

মিসরীয় সংস্কৃতিতে নারী

আমরা পাঁচ ভাইবোন একত্রে বড় হয়েছি। চার বোন, এক ভাই। মিসরে গিয়ে জানতে পারলাম, মানুষ মনে করে, আল্লাহ যাকে একটি ছেলেসন্তান দান করেছেন সে ভাগ্যবান। এমনকি তাদের অনেকে একটি মাত্র ছেলেসন্তানের জন্য অনেক চেষ্টা করে। একাধিক সন্তান জন্ম দেয়। কন্যাসন্তানদের কথা আর কী বলব!

মিসরীয় বিভিন্ন সিরিয়াল ও ফিল্মে আমি এমন অনেক বক্তব্য শুনেছি, যেখানে নারীকে হেয় করা হয়েছে কিংবা নারীর অবস্থানকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। যেমন বলা হচ্ছে, 'রাখো মহিলাদের কথা' অথবা 'ধুরু, এসব তো মহিলাদের কাজ'। বিপরীতে পুরুষকে অনেক সম্মানিত ও প্রশংসিত হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'এই তো পুরুষের মতো কথা'। অর্থাৎ পুরুষের কথা সঠিক, যৌক্তিক ও উপকারী। বিশেষত আমি যখন উচ্চমাধ্যমিকে পড়ি তখন সমাজের মাঝে ছড়িয়ে থাকা এসব বাক্য আমাকে দংশন করতে শুরু করে। আমি এসব বিষয় নিয়ে বেশ ক্ষিপ্ত ছিলাম।

আমেরিকান সংস্কৃতিতে নারী

আমি যা বলব তা কোনো টেলিভিশন বা আমেরিকান ফিল্ম থেকে গৃহীত নয়; বরং আমি নিজেই ছিলাম সে দৃশ্যপটের সাক্ষী। সেখানের সরকারি স্কুলে আমি পড়েছি। বড় হওয়ার সাথে সাথে আমি প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারছিলাম। সেখানে শুধুমাত্র নারী হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং সব দিক থেকে পুরুষের চেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ হতে হবে। সব ক্ষেত্রেই ছেলেদের সাথে পাল্লা দিতে হবে। এমনকি ছেলেরা যেমন ব্যায়াম করে পেশিকে স্ফিত করে, মেয়েদেরও তা করতে হবে। অনুভূতিগত দিক থেকেও ছেলেদের মতো স্থির হতে হবে। তাদের মতো শক্ত ও অনঢ় চিন্তার অধিকারী হতে হবে।

আমেরিকান সমাজ আমাকে নিয়ে এই বলে ফিসফিস করতে ছাড়েনি যে, মেয়েটি আবেদনময়ী নয়। ছেলেদেরকে আকর্ষণ করার মতো কিছু নেই তার ভেতর। বেচারি আসলেই বোকা ও সরল। এই বার্তা আমাকে দিয়েছে আমেরিকান ম্যাগাজিনগুলোর প্রচ্ছদ, তাদের গানের লিরিক্স, তাদের প্রতিদিনের আলোচনা। অমুসলিম-বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এই চিত্র আমাকে ব্যথিত করেছে।

নারী ও ইসলামি শরিয়ত

আমি ছাড়াও অন্য অনেক মেয়ে বিকৃত ও বিষাক্ত প্রচারণার শিকার হয়ে ধরেই নিয়েছে যে, ইসলাম নারীর যত্ন নেয় না; বরং তাকে ছুঁড়ে ফেলে এবং তার ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা লালন করে।

নারীত্বের ব্যাপারেও তখন আমার কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না যে, আমি বুঝতে পারব নারীত্ব কী? কীভাবে তার প্রকাশ ঘটে? নারীত্ব কি সুন্দর বিষয় নাকি কুৎসিত? এটি কি সম্মানিত নাকি অপমানজনক?

কিছু অস্পষ্ট চিন্তা ও প্রশ্নবোধকচিহ্ন আমার ভেতরে একটু একটু করে বেড়ে উঠছিল। প্রায়শই আমি চিন্তা করতাম, কেন ইসলামি শরিয়ত নারী ও পুরুষের মাঝে এ ধরনের পার্থক্য করল? বিষয়টি আমার জন্য চ্যালেঞ্জের ছিল না। আমি এক লিঙ্গের ওপর অপর লিঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়ার চিন্তায় পরিতৃপ্ত ছিলাম। আমার চিন্তার শেষ ফলাফল ছিল-পুরুষের জন্য ভিন্ন বিধান, যা তাদের পবিত্রতা ও মর্যাদার প্রকাশ ঘটায়। বিপরীতে নারীর জন্য লজ্জা ও অপমানের চিহ্ন বহন করে। ইসলামে নারীর অবস্থান বিষয়ক এই ছিল আমার সামগ্রিক ধারণা। যা আমি নারীদের সঙ্গে বিশিষ্ট কিছু বিধান থেকে বুঝতে পেরেছিলাম। যেমন: হিজাব, পুরুষের কর্তৃত্ব, ঘরের ভেতর অবস্থান ইত্যাদি। পারিপার্শিক বিভিন্ন বিষয় আমার চিন্তাকে সমর্থন করছিল। তাই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, ইসলাম নারীকে তার সহোদর পুরুষ থেকে নিম্নতর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে। আমি তখন সুস্পষ্ট পরিসংখ্যান বের করেছি যে, মিসরীয় সংস্কৃতি ও আমেরিকান সংস্কৃতির সাথে ইসলামের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সবার একই বক্তব্য-পুরুষরা ভালো, নারীরা খারাপ।

অধিকাংশ তরুণরাই সংকীর্ণ চিন্তা লালন করে। যা ইনসাফের ক্ষেত্রে প্রান্তিক। আমার চিন্তাও এমন ছিল। আমেরিকায় মাধ্যমিক পড়াকালীন আমাকে শেখানো হয়েছিল, ইনসাফ ও সমতা পরস্পর সমার্থক। একটি অপরটির পরিপূরক। আমি বুঝতাম, নারী ও পুরুষের মাঝে ইসলাম যে সমতা করেনি, তা কখনোই ইনসাফ হতে পারে না। কিন্তু আসলে ইনসাফ কী? এ ব্যাপারটি আমি বুঝতাম না।

আমার বাবা একজন ধৈর্যশীল ভালো মানুষ। তিনি আমার পনেরো বছরের তরুণ কণ্ঠের অনেক ঝাঁঝালো প্রশ্নের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন। আর আমার প্রশ্নও ছিল অনেক বেশি ও বিরক্তিকর। ছিল অনেক বিদঘুটে। কিন্তু তিনি কখনোই সেগুলো হালকাভাবে দেখেননি। তিনি আমার সঙ্গে স্নেহ ও ভালোবাসার আচরণ করেছেন। আমাকে প্রশ্নের জালে ফেঁসে যেতে দেননি। একের পর এক দ্রুত প্রশ্ন করে যেতাম। প্রশ্নের ধরন ছিল এমন-কেন নারীকেই শুধু হিজাব পরতে হবে? পুরুষকে কেন নয়? বিষয়টি জটিল বলে আমি জানতে চাচ্ছি এমনটি নয়; বরং আমি চাইতাম পুরুষরাও আমাদের মতো মুখ ঢেকে চলুক।

আমার বাবা ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে আমার এসব সংশয়কে দূর করার চেষ্টা করতেন। আমার চিন্তার মাত্রা ছিল তখন-হ্যাঁ, কিংবা না। সাদা কিংবা কালো। এর বাইরে তৃতীয় কোনো কথা নেই। কিন্তু বাবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি একঘেয়েমি করে যেতাম। একই কথা বারবার বলতে থাকতাম। আমি আমার নিজের অবস্থানেই অটল থাকতাম। তার প্রতিটি কথা আমার মতো করে ব্যাখ্যা করে নিতাম। এককথায় এগুলো ছিল আমার অহংবোধ ও একঘেয়েমি। প্রতিদিন বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আমি একই প্রশ্ন করতাম। কিন্তু তিনি বিরক্ত হতেন না এবং

আমাকে উত্তর দিতে আপত্তি করতেন না। আমার চিন্তার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল সমতা ও ইনসাফকে একাকার করে ফেলা। একজন তরুণী বা যুবতি হিসেবে এই একটি চিন্তাই আমাকে নারীবাদের ট্রেনের আরোহী করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ তাদের স্লোগানই ছিল- নারী-পুরুষের মাঝে সমতা বিধান করো। ইনসাফ ও সমতাকে তারা সমর্থক হিসেবেই প্রকাশ করত।সমতা মানেই ইনসাফ। সমতাই নারীর একমাত্র লক্ষ্য। যা ছাড়া কিছুতেই সে আপস করবে না। নারীবাদের এই মূর্খতাসুলভ চিন্তা আমার ভেতরে শক্তভাবে বাসা বেঁধেছিল।

_________★★★_________

নারীত্ব ও শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক প্রভাব

আমি একজন মুসলিম তরুণী। আমি আমেরিকার সরকারি স্কুলে মাধ্যমিক পড়েছি। সেখানকার ছাত্রীদের মৌলিক ব্যস্ততা হলো বাহ্যিক বেশভূষা নিয়ে। পোশাক, জুতা, অলংকার ইত্যাদি। বিষয়টি মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন বাস্তব, ছেলেদের ক্ষেত্রেও তেমনই। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা একেবারে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের। বিষয়টি প্রকাশ পায় মেকাপের জগৎ সম্পর্কে তাদের প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা থেকে। চুলের রং ও কাটিংয়ের ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্নশীল হওয়া থেকে। কখনো কখনো তা বিভিন্ন ধরনের সার্জারি, বিভিন্ন অঙ্গ ছিদ্র করা ও শরীরে বিভিন্ন ট্যাটু অঙ্কন করা পর্যন্ত পৌঁছায়।

আমার দৃষ্টিতে নারীদের শালীন ও লজ্জাশীল রূপ, যা ইসলাম সমর্থন করে, তা এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কর্তৃক সমর্থিত অতিমাত্রায় রূপ প্রদর্শনী-উভয়টি কখনোই একত্রে চলতে পারে না। এ দুটির মাঝে সমন্বয়ের চেষ্টা করা বৃথা ও অসম্ভব বই কিছুই নয়।

প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তখন গুরুত্ব পেতে থাকে তথাকথিত 'বয়ফ্রেন্ড'। তা সত্ত্বেও আমি তাদেরকে সবসময় ভীত থাকতে দেখেছি। বরং চূড়ান্ত পর্যায়ের ভীত থাকতে দেখেছি। যখন কারও ছেলেবন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদের পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন তার হৃদয় বেদনাসিক্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ প্রচুর কান্নাকাটি করে। অধিকাংশ মেয়েই সম্পর্কচ্ছেদের কারণ হিসেবে নিজের সৌন্দর্যের কমতি ও ব্যক্তিত্বের ত্রুটিকে দুষতে শুরু করে। এভাবে তারা আত্মমর্যাদাকে নষ্ট করে এবং হীনম্মন্যতার পথে পা বাড়ায়।

একজন মুসলিম তরুণী হিসেবে নারীত্বের এই লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত আমাকে প্রচণ্ড রাগান্বিত করে তোলে। আমি চিন্তা করি যে, আমার অবয়ব, পোশাক, হিজাব-যদিও তখন আমি মনে করতাম, নারীত্ব ও শালীনতা কখনো একত্রে চলতে পারে না- এগুলো ওইসব মেয়েদের মূর্খতা ও কপট ফ্যাশন থেকে উত্তম। অথচ আমি তখন জানতাম যে, মিসরে হিজাব ও ওড়না পরা সত্ত্বেও নারীদের ব্যাপারে কী ধরনের মানসিকতা লালন করা হয়। তবুও আমেরিকার উলঙ্গ সমাজের তুলনায় হিজাবই আমার কাছে স্বাধীনতার প্রতীক মনে হতো। ফলে আমার পোশাক অন্যদের তাচ্ছিল্য ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে গেল।

মাধ্যমিকে পড়াকালীন এই শূন্যতা ও অস্থিরতার মাঝেও আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, নারীত্ব মানেই দুর্বলতা, সরলতা আর এসব মূর্খতা আমি নিজের ক্ষেত্রে কখনোই তা মেনে নিতে পারব না। তাই আমার কী করা উচিত, তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এজন মুসলিম নারী

হিসেবে আমার কেমন হওয়া উচিত? আমার কী শালীন হওয়া উচিত নাকি দুর্বল হওয়া উচিত? আমি আসলে কী করতে চাই? আমার লক্ষ্য কী? কীভাবে আমি সেখানে পৌঁছব? এসব প্রশ্ন আমাকে তাড়া করতে থাকে।

তারপর একটি জবাব আসে-ওয়েলকাম! আমাদের সাথে এসো। নারীবাদই তোমার সব সমস্যার সমাধান!

__________★★★_________

নারীত্ব, নারীবাদ নয়

১. নারীত্ব

একসময় নারীত্ব ও নারীসুলভ বিষয়গুলো নিয়ে আমি দ্বিধা ও সংশয়ে ভুগতাম। আমার কাছে সেগুলো দুর্বলতা ও ত্রুটি মনে হতো। কিন্তু এখন আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, একজন সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন নারীর জন্য নারীত্বই হলো পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। যেমনটি একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক রুচিবোধসম্পন্ন পুরুষের নিকট পুরুষত্ব হলো পূর্ণতার মাপকাঠি। নারীত্ব হলো এমন এক বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে একজন নারী তার প্রকৃত দায়িত্বটুকু পালন করতে পারে। এজন্য তাকে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে হয় না। পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয় না। তথাকথিত সফলতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি উতরে যেতে হয় না।

২.লজ্জাশীলতা

ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদ আমাদের কানে বারবার যে বুলি আওড়াতে থাকে তা হলো-লজ্জা দুর্বলতার প্রকাশ। আর নির্লজ্জতা শক্তিমত্তার প্রকাশ। অথচ বাস্তবতা এমন নয়।

একজন লজ্জাশীল নারী কখনোই সেকেলে ও পশ্চাদগামী নন। তিনি কখনোই পরাজিত, অধিকারবঞ্চিত ও সম্মান হারানো মানুষ নন; বরং তিনিই হলেন প্রকৃত নারী, যিনি জীবনের স্বচ্ছ ও পূর্ণ বৈশিষ্ট্য লালন করেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, "হায়া' (লজ্জা) হলো 'হায়াত' (জীবন) থেকে নিসৃত। বৃষ্টিকে জীবন বলা হয়। কারণ তা জমি, শস্য ও গবাদি পশুর জীবন। সুতরাং যার হায়া নেই সে দুনিয়ার জীবনে মৃত, আখেরাতে বঞ্চিত।' অর্থাৎ লজ্জা ও জীবন দুটি এমন বিষয়, যা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

৩. স্বাবলম্বিতা

আমার ধারণা, আমি স্বাবলম্বিতা ও ক্ষমতায়নের কুসংস্কার থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। আমার স্বভাব ও স্বাভাবিক রুচিবোধের বিরুদ্ধে গিয়ে আমি চলতে চাই না। নিজেকে কষ্ট দিয়ে অন্যদের সামনে অন্যের দৃষ্টিতে কোনো পদবি লাভ করতে গিয়ে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো

চাকুরি করতে গিয়ে আমি নিজের মূল্যবোধ, স্বাধীনতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাভাবিক জীবনকে বলি দিতে চাই না। এগুলোর পেছনে সময় দিতে গিয়ে আমি আমার বৈবাহিক সম্পর্ককে শিথিল করতে চাই না।

৪. স্বামীর ওপর নির্ভরশীলতা

আমার স্বামী আমার জন্য যা খরচ করে তা নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আমাদের পরিবারের জন্য তিনিই একমাত্র ঘরের বাইরে কাজ করেন। আমি আমার প্রকৃত দায়িত্ব ও কাজ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর তার কাছ থেকে অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করার মাঝে কোনো মূল্যবোধের কমতি ও মূল্যায়নের অধঃপতন দেখতে পাইনি। আমি আমার নিজের কর্মক্ষেত্রে

রয়েছি। কেন আমি তার অঙ্গনে গিয়ে প্রতিযোগিতা করব? তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার লাভ কী?

সবকিছুর শেষে আমার অনেক বড় শান্তি হলো, আমি সবকিছুই করতে পারছি এবং সব ইচ্ছাই বাস্তবায়ন করতে পারছি। এজন্য আমাকে চাকুরি করে ক্লান্ত হতে হচ্ছে না এবং নিজেকে প্রমাণ করার যুদ্ধে নামতে হচ্ছে না।

স্বামীর পাশে থাকা, আমার দায়িত্ব গ্রহণ করা, আমাদের ছোট পরিবারকে পরিচালনা করা আমাকে নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়। আমি আশ্বস্ত!

৫. লিঙ্গসমতা ও বিয়ে

জীবন উভয় লিঙ্গের মাঝে মল্লযুদ্ধের মঞ্চ নয়। নারী ও পুরুষ, স্বামী ও স্ত্রী-পরস্পরের মাঝে বিবাদ করার জন্য আমরা সৃষ্ট নই। একজনকে টিকে থাকতে হলে অন্যকে শেষ করে দিতে হবে, এমনটি নয়। পৃথিবী বিভিন্ন লিঙ্গের মানুষের রণক্ষেত্র নয়।

স্বামী ও স্ত্রী উভয় মিলে একটি দল। যেমন সূর্য ও চন্দ্র, রাত ও দিন। তারা একে অপরের পূর্ণতা। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তারা উভয়ে একসাথে কাজ করে। একে অপরের সহায়তায় এগিয়ে আসে, যাতে প্রকৃত সফলতা লাভ করা যায়। এ যাত্রায় চলতে গিয়ে তারা ক্লান্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আবারও ঘুরে দাঁড়ায়। এত এত শ্রম দিয়ে তারা একটি মুসলিম পরিবার গঠন করে। যা উম্মতে মুসলিমা নামক দুর্গের একটি ইট হয়ে যায়।

৬. মাতৃত্ব ও চাকুরি

আজকাল নারীদের মাঝে মাতৃত্ব ও চাকুরি সম্পর্কে যে চিন্তার চাষাবাদ করা হয়েছে, তার ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা খুবই জরুরি। তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে, তোমাকে দুটোর যেকোনো একটি করতে হবে। একজন মা হয়ে পরিবারকে আগলে রাখতে ঘরে অবস্থান করতে হবে, অথবা বাইরে কর্মাঙ্গনে যোগ দিয়ে নিজের বিরাট সফলতাকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

মাতৃত্ব কোনো কারাগার নয়, আপনার ঘর কোনো অন্ধকার কুঠুরি নয়, যেখানে আপনাকে কেউ হাত পা বেঁধে ফেলে রেখেছে। কে বলেছে আপনাকে এসব কথা?

আপনি একজন মা। আপনি চাইলে আপনার মনমতো চলতে পারেন এবং ইচ্ছে স্বাধীন থাকতে পারেন। আপনি চাইলে আপনার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে ঝালাই করে নিতে পারেন। ইচ্ছে হলে নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারেন। নিজের সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারেন। একজন মায়ের মতো করে এ সবকিছুই করা আপনার পক্ষে সম্ভব। মাতৃত্ব মোটেও দমবদ্ধ কোনো কাজ নয়, যেমনটি তারা আপনার সামনে চিত্রায়িত করেছে!

৭. নারীত্বের শক্তি

নারীত্ব দুর্বলতা, ভঙ্গুরতা, অক্ষমতা বা নির্বুদ্ধিতার সমর্থক নয়। বস্তুত তা শক্তি থেকে পৃথক নয়। কিন্তু নারীর মূল শক্তি হলো পুরুষের শক্তির সাথে মানিয়ে চলা। এই সরল বিষয়টি না বোঝার ফলে আমি আমার জীবনের বড় একটা অংশ ভুল পথে চলেছি। শারীরিক শক্তি

অর্জনের জন্য কসরত করেছি। পুরুষের সাদৃশ্য হওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করেছি। এ লক্ষ্যে চলতে গিয়ে কতজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। যারা আমাকে এখান থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করেছিল। নিজের পেশিশক্তি প্রকাশ করার জন্য কত পন্থায় চেষ্টা চালিয়েছি। এমনকি নারীদের মানানসই রঙের পোশাক পরিধান করাও আমি ত্যাগ করেছিলাম। এ সবকিছুই করেছিলাম শক্তিমত্তা সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে।

৮. ইসলাম কি নারীর বিরোধী?

এই প্রশ্নের দ্রুততম উত্তর হলো-'না'।

ইসলাম কখনোই নারীর বিরোধী নয়, ঠিক যেমন পুরুষের বিরোধী নয়।

ইসলাম নারী বিরোধী বলে যা প্রচার করা হয় তা নিছক অপবাদ, যার কোনো ভিত্তি নেই। 'নারীবাদ' ইসলামের ওপর এই অপবাদ আরোপ করেছে। কিছু বিষয়কে বিকৃত উপস্থাপন করে তারা এই অভিযোগ চাপিয়ে গিয়েছে। তারপর গোটা ধর্মের নামে বিষোদগার করেছে। মহান আল্লাহ হলেন সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার অধিকারী। তিনি তার বান্দাদের প্রতি সরিষাদানা পরিমাণ অবিচার করেন না। হোক সে নারী বা পুরুষ। তিনি অবিচারকে নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছেন।আমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যে সব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গুণাবলির অধিকারী। কেউ এমন নেই, যে সকলের থেকে অমুখাপেক্ষী। আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো দিকে কমতি রয়েছে। আপনার যে দিকটায় কমতি রয়েছে আপনার স্বামীর সে দিকটায় পূর্ণতা আছে। আবার আপনার স্বামীর যে দিকটায় কমতি রয়েছে আপনার সে দিকটায় রয়েছে পূর্ণতা। আপনারা উভয়ে যখন পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হবেন তখন তা পূর্ণতায় রূপ নেবে। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের ওপর নারীর নির্ভরশীলতা দুর্বলতা বা অক্ষমতার জন্য নয়; বরং মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মাঝে সমন্বয়ের জন্য। তিনি আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা আমাদের জন্য উপযোগী। তিনি এক বিস্ময়কর আকৃতি আমাদের দিয়েছেন, যা ভাবতেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

তাই নিজেদের স্বভাব ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা যা কিছু পদক্ষেপ নেব, তা নিশ্চিতভাবে আমাদের দুঃখ ও ক্লান্তির কারণ হবে; এটাই যৌক্তিক।

৯. ভয় ও আতঙ্ক নয়, ভরসা করুন

সম্ভবত নারীবাদ যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি তামাশা করেছে এবং মানুষের মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করেছে তা হলো-'ভয়'।

নারীদের মনকে তারা পুরুষের প্রতি ভয়, অবিশ্বাস ও কুধারণা দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছে। তারপর একজন নারী যখন একান্তে সময় কাটায় তখন তার ভেতরে অনেক অস্থিরতা ও প্রশ্ন জন্ম নিতে থাকে। যার কোনো সমাপ্তি নেই। সে ভাবতে থাকে, কী হতো যদি...।

আমার স্বামী যদি আমাকে ছেড়ে যায় তাহলে কী হবে? সে যদি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে কী হবে? যদি তার দুশ্চরিত্র প্রকাশ পায় আর সে আমাকে বিভিন্নভাবে অপমান

করে? যদি সে মরে যায়, তখন কে আমাকে সাহায্য করবে? সে মরে গেলে আমি কি আশ্রয়হীন হয়ে পড়ব? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এগুলো এমন প্রশ্ন যা দূর করার একটাই অস্ত্র। তা হলো-আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা। এ ধরনের সকল প্রশ্নের উত্তর ও ওষুধ এই একটাই। আমাদের সারাটি জীবন অজ্ঞতা, ভয় ও সন্দেহ দিয়ে পরিপূর্ণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'যদি' প্রশ্নটা আমাদের থেকেই যায়। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। একদিক ঠিক হলে অপরদিক ঠিক থাকে না। কারণ এটি মৌলিকভাবে পরীক্ষার জায়গা। অবস্থান বা উপভোগের জায়গা নয়।

আমরা যদি রাজত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী আমাদের মহান রবের প্রতি সত্যিকারের ভরসা করতে পারি, যে মহান সত্তা থেকে আসমান ও জমিনের সরিষাদানা পরিমাণ বস্তু অগোচর নয়, তার প্রতি আস্থা রাখতে পারি, তাহলে সব বিপদ ও দুর্দশার মোকাবিলা করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। আমরা তখন বড় প্রতিদান ও আখেরাতে সাওয়াবের আশা রাখতে পারি।

তাই স্থির হোন। আপন রবের সাথে অন্তরঙ্গ হোন। নারীবাদের ভয়ের ব্যবসার ভোক্তা হবেন না। মহান আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট।

১০. ইসলাম আমাদের গর্ব

ইসলাম আমাদের চেতনা। আমরা মুসলিম নারী, আল্লাহর বান্দি। এটাই আমাদের আত্মপরিচয়। এটা নিয়েই আমরা গর্বিত ও সম্মানিত।

মুক্তির পয়গাম লেখার জন্য আমাদের কোনো নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ হাতের প্রয়োজন নেই। আমাদের পশ্চাৎপদতা থেকে রক্ষা করতে তাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। আমাদের পথের আঁধার দূর করতে অন্য কারও প্রদীপ নিয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই।

আমরা মুসলিম। আমাদের হাতে মহান আল্লাহপ্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান রয়েছে। আমাদের কাছে এমন দীন রয়েছে, যা সম্মান, সুখ ও মর্যাদার চাবিকাঠি। তথাকথিত আলোকিত চিন্তা আমাদের জীবনকে অস্থিরতা ও অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেবে না। ওহির আলোকিত পথই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

আমরা মুসলিম নারী। আমাদের নিকট ইসলাম আছে। এটাই যথেষ্ট।

__________★★★__________

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামি শরিয়াহ ও নারী অধিকার..

র‍্যান্ড কর্পোরেশন মনে করে, সমাজে নারীদের পিছিয়ে থাকার জন্য ইসলামি শরিয়াহ দায়ী। কারণ ইসলামি শরিয়াহ নারীর ওপর বিভিন্ন ধরনের বিধান ও শর্তারোপ করার মাধ্যমে তাদেরকে সমাজ থেকে পিছিয়ে রাখে। নাইন ইলেভেনের পর প্রকাশিত র‍্যান্ড কর্পোরেশনের এক রিপোর্টে বলা হয়, শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা উগ্রবাদী মুসলিমদের রাজনৈতিক সূচিপত্রের প্রধান বিষয়। আর শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা নারীদের ওপর বিভিন্ন শর্তারোপ করার মাধ্যমে মূলত নারী-অধিকারকে খর্ব করে।*

র‍্যান্ড কর্পোরেশন কর্তৃক ২০০৭ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি উগ্রবাদী মুসলিমদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তবে সেটা বিশেষভাবে সমাজে নারীদের অবস্থানকে ধ্বংস করে দেবে। কারণ, নারীরা শরিয়াহ আইনের অধীনে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। ফলে এই শরিয়াহ আইন গণতান্ত্রিক রূপায়নকে এবং যারা নারী-অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করছে তাদের সকল প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করে দেবে।

পাশাপাশি রিপোর্টটিতে লিবারেল ও সেকুলারদের আহবান করা হয়েছে, শরিয়াহর অধীন সকল প্রকার বৈষম্য ও ধর্মান্ধমূলক আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং এমন রাজনৈতিক ও বিচারব্যবস্থা তৈরিতে কাজ করতে, যেখান থেকে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে কর্মরত সংস্থাগুলোর বিস্তার লাভ হয়।

পাশাপাশি র‍্যান্ড নারীদের কট্টর ইসলাম ও ইসলামি শরিয়াহর জড়, আবদ্ধ ও অকেজো ব্যাখ্যার (র‍্যান্ডের দাবি অনুযায়ী) বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্যও উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, তাদের ধারণা অনুযায়ী কট্টর ইসলাম ও শরিয়াহর পুরাতন ব্যাখ্যার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয় নারীরা।

_________★★★________

র‍্যান্ডের অপবাদের জবাব

র‍্যান্ডের বক্তব্য হলো, ইসলামি শরিয়াহ বিভিন্ন শর্তারোপ করে নারী-অধিকারকে খর্ব করে। এই বক্তব্য দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, নারীদের মাহরামবিহীন সফরে বাধা দেওয়া, ফ্রি-মিক্সিংয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, বেপর্দা চলতে নিষেধ করাসহ এই ধরনের কিছু বিধানাবলি। এই দাবি সত্য এবং এরকম বিধিনিষেধ ইসলাম কেবল নারীদের ওপরই আরোপ করেনি; বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ওপরই ইসলাম বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। আর এই বিধিনিষেধ আরোপের ব্যাপারটি আল্লাহর উবুদিয়্যাত তথা দাসত্বের দাবি, মুসলিমরা যে ইসলামকে গ্রহণ করে, সেই দীনের দাবি। বস্তুত প্রকৃত মুসলিম নরনারীরা বিশ্বাস করে, শরিয়াহর বিধান পালন করতে পারা এবং তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকতে পারা তাদের মৌলিক অধিকার। কারণ ইসলাম শব্দের অর্থই হলো, আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়াহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ ও নতি স্বীকার করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا .فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

'আমি প্রত্যেক রাসুলকে এ উদ্দেশ্যেই কেবল পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুমে তাঁর আনুগত্য করা হবে। তারা যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা তোমার দরবারে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং রাসুলও তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করত, তবে তারা আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পেত।
(হে নবি!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে। সুরা নিসা আয়াত ৬৪-৬৫

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ.

'যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আর যারা তার ডাকে সাড়া দেয়নি, তারা যদি দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ ও তার সমপরিমাণ সম্পদের মালিক

হয়ে যায়, তবুও তারা (কিয়ামতের দিন) নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা সবই দিতে প্রস্তুত। হয়ে যাবে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট রকমের হিসাব এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম; অনন্তর শয্যাস্থল হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্ট স্থল!' সুরা রাদ আয়াত ১৮

__________★★★_________

ইসলামি শরিয়াহ ও নারী অধিকারের ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের অবস্থান ও মুসলিমদের দায়িত্ব

প্রথমত, র‍্যান্ড কর্পোরেশন নারী-অধিকারের কোনে কোনো গ্রহণযোগ্য, যৌক্তিক সংজ্ঞা উপস্থাপন করতে পারেনি। চাই সেটা নারীর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট হোক। নারী-অধিকার সংশ্লিষ্ট স্লোগানগুলোর পক্ষে অবস্থান নেওয়ার একমাত্র কারণ হলো পশ্চিমা স্বার্থ বাস্তবায়ন করা। ফলে তাদের মুখে এই কথা মানায় না যে, ইসলামি শরিয়াহ নারীর অধিকার খর্ব করেছে কিংবা ইসলামি শরিয়াহ নারীকে পিছিয়ে রাখছে। কারণ নারীর প্রকৃত অধিকার তারা কখনোই বাস্তবায়ন করতে চায় না; বরং নারীর প্রতি তাদের ব্যাপক আগ্রহের একমাত্র কারণ হলো, মুসলিমদের ভেতর পশ্চিমা স্বার্থ পাকাপোক্ত করা।

দ্বিতীয়ত, র‍্যান্ড কর্পোরেশনের (জাতিসংঘহ এই ধরনের বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর চরিত্রও এক) আলোচনার প্রধান চরিত্র হলো পলিসি মেকিং, অর্থাৎ নারী-অধিকার, স্বাধীনতা ও দায়িত্ব নিয়ে তুলনামূলক কোনো আলোচনা তাদের নেই। তারা কেবল কিছু এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কিছু পলিসি নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নারীর ব্যাপারে ইসলামি শরিয়াহর অবস্থান ও তার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কোনো বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা তাদের আলোচনায় পাওয়া যায় না। ইসলামি শরিয়াহর এই বিধানটা কেন অন্যায় আর তাদের প্রস্তাবনাটা কেন ন্যায়-এসব প্রশ্নের কোনো সমাধান তারা দিতে পারবে না; বরং তারা যেটা করে সেটা হলো, ইসলামি শরিয়াহর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য মুসলিম তরুণীদের পলিসি ঠিক করে দেয়। সুতরাং র‍্যান্ড কর্পোরেশনসহ নারীবাদী সংস্থাগুলো কখনো বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা উপস্থাপন করে না; বরং তারা পূর্বনির্ধারিত কিছু উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য মুসলিমদের ওপর বিভিন্ন পলিসি চাপিয়ে দেয় কিংবা মুখরোচক কিছু স্লোগানের আড়ালে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের লক্ষ্যটা হাতে ধরিয়ে দেয়। ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী মুসলিমরা যা করে, সেটা সঠিক নাকি বেঠিক-র‍্যান্ড কর্পোরেশনের মতো আধুনিক প্রাচ্যবাদী সংস্থাগুলোর কাছে এর পর্যালোচনা নেই। তাদের কথিত গবেষকদের মূল আগ্রহ হলো, তাদের চাহিদা মুসলিমরা কীভাবে বাস্তবায়ন করবে, সেই আলোচনা করা।

নারী-অধিকার ও নারী-স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের ওপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, এটা একই সাথে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। এই যুদ্ধে আমাদের পবিত্র শরিয়াহকে সংরক্ষিত রাখতে চাইলে এবং পুরো পৃথিবীকে আন্তর্জাতিক মানবরচিত জাহালাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানের মহৎ দায়িত্ব পালন

করতে হবে। বিশেষত প্রত্যেক এমন স্লোগান ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে, যেগুলো বিকৃত নারী-অধিকার আন্দোলন, নারীবাদী সংস্থাকে ও নারী সংশ্লিষ্ট শরিয়াহ-অসম্মত দাবিকে জোরদার করতে পারে। কারণ আমরা যদি এসব স্লোগান ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে না দাঁড়াই, তবে দিনশেষে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে এবং তারা আল্লাহর শরিয়াহকে অপসারিত করবে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ .قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ.

'বলে দাও, হে কিতাবিগণ! আল্লাহর পথে বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টা করে মুমিনদের জন্য তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করছ কেন, অথচ তোমরা নিজেরাই প্রকৃত অবস্থার সাক্ষী? তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কিতাবিদের একটি দলের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে ছাড়বে।'সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৯-১০০

নিশ্চয় বান্দার জন্য ভয়াবহতার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় ফিতনা হলো নারী-সংক্রান্ত ফিতনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি আমার পর পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।
অন্য হাদিসে তিনি নারীদের থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। কারণ পুরুষদের অন্তর নারীদের প্রতি ধাবিত থাকে এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের জন্য উদগ্রীব থাকে।

মুসলিমদের জন্য উচিত হবে না, ফিকহের দুর্বলতম কিংবা অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুসরণের মাধ্যমে কিংবা জমহুর উলামায়ে কেরামের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে পশ্চিমা স্বার্থ বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ.

'হে মুমিনগণ! যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তোমরা যদি তাদের কথা মানো, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের পেছন দিকে (কুফরের দিকে) ফিরিয়ে দেবে। ফলে তোমরা উল্টে গিয়ে কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু বোনদের তৎপর হওয়া উচিত, যারা ইলমি ও আদর্শিক যোগ্যতায় উত্তীর্ণ। এ সমস্ত বোন মুসলিম তরুণীদের সামনে ইসলামি শরিয়াহর

বিধানগুলো আপসহীনভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তুলে ধরবেন। তারা প্রভাব বিস্তারকারী হবেন, প্রভাবিত হবেন না। তাদের বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট, যেখানে থাকবে না পশ্চিমা সংস্কৃতির কাছে নতি স্বীকার। এর জন্য তারা পরিমিত পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম ব্যবহার করবেন। নারীদের জন্য বিশেষ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে তার আওতায় নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করবেন।

_________★★★_________

জব সেক্টরে নারী

ইসলামি শরিয়াহ নারীর প্রতি সবচেয়ে দয়াশীল ও ফিতরাতবান্ধব নীতিমালা প্রদান করেছে। পরিপূর্ণ ঘরে থাকা অবস্থাতেও ইসলামি শরিয়াহ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। এর জন্য তাকে বাইরের দুনিয়ার নাকানিচুবানি, কষ্ট-ক্লেশ, ব্যস্ততা ও পরিশ্রমের শিকার হতে হয় না।

ইসলামি শরিয়াহর পক্ষ থেকে পুরুষরা তাদের অধীনস্থ নারীদের ব্যয়ভার বহন করতে আদিষ্ট। তাদের প্রতি এই নির্দেশ অনুগ্রহ হিসেবে নয়; বরং আবশ্যিকতার জায়গা থেকে পুরুষরা নারীদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে আদিষ্ট। নারীদের এই ব্যাপারে কোনো প্রকার খোঁটা কিংবা খোঁচা দেওয়ার অধিকার তাদের নেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

'প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচা দেবে আর যার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে খরচা দেবে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন, তার বেশি ভার তার ওপর অর্পণ করেন না। কোনো সংকট দেখা দিলে আল্লাহ তারপর স্বাচ্ছন্দ্যও সৃষ্টি করে দেবেন।'সুরা তলাক, আয়াত ৭

الرِّجَالُ قَوْمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

'পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ (নারীদের জন্য) নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।
সুরা নিসা, আয়াত ৩৪

আবার নারীরা তাদের মালিকানাধীন অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীন। তারা বৈধ যেকোনো ক্ষেত্রে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করতে পারবে।

শরিয়াহনুসারে একজন নারীর প্রধান দায়িত্ব হলো, গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করা ,
সুরা আহযাব, আয়াত ৩৩,
পরিবার গড়ে তোলা, পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করা এবং ঘরের ভেতরটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা; এটাই একজন নারীর মূল পেশা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নারী তার স্বামীর ঘরের প্রতি দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'

তবে কোনো প্রয়োজন কিংবা কল্যাণের কারণে কোনো নারী চাকরি করতে বাধ্য হলে ইসলাম নারীকে তার অনুমোদন দিয়েছে। সাথে সাথে চাকরির জন্য কিছু শর্ত ও সীমাও বেঁধে দিয়েছে। যেন সেই নারীর দীন ও ফিতরাত সংরক্ষিত থাকে। যেমন অবশ্যই সেই কর্মটা নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া ও অবস্থানের সময় অবশ্যই তাকে শালীনতা, পর্দা, ইবাদাহ বজায় রাখতে হবে এবং ফ্রি-মিক্সিং ও পরপুরুষের সঙ্গ থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে, ফিতনা ও উত্তেজনাকর স্থান থেকে নিরাপদ থাকতে হবে এবং তার এই চাকরি পরিবারের দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টিকারী না হতে হবে।

এজন্যই ইসলাম নারীদের জন্য সাধারণ নেতৃত্বকে নিষিদ্ধ করেছে। কারণ,

নেতৃত্বদান তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এই কাজ তার মূল দায়িত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তা ছাড়া নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাইরের তৎপরতাসমূহ পরিচালনার সময় তার পক্ষে ইসলামের আবশ্যকীয় বেশ কিছু বিধান পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে। নেতৃত্বের সাধারণ দাবিই এমন যে, জনসাধারণের মাঝে বেশি বেশি যেতে হবে, নারী-পুরুষ সবার সাথে মিশতে হবে। অনুরূপ আরও জটিলতা আছে, যা নারীর দীন-বিধ্বংসী হতে পারে।"

নিশ্চয় ইসলাম নারী-পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মের মাঝে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দিয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে কখনোই ইসলাম নারীর মর্যাদাহানি করেনি। তার মানব-প্রকৃতি ও যোগ্যতার ব্যাপারে তিরস্কারও করেনি। এই পার্থক্য কিংবা প্রভেদ নারী-পুরুষের সম্পূরক জীবনকে সহজ করার লক্ষ্যেই করা হয়েছে। এই পার্থক্যের ভিত্তি হলো, ইনসাফ এবং নারী-পুরুষের মাঝে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতার ভিন্নতা।

যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও দায়িত্বে নারী-পুরুষের মাঝে সমতার বিধান করতে চায়, তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে একই শরীরের প্রতিটি অঙ্গের দায়িত্ব ও কর্মের মাঝে সমতার বিধান করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ সে কোনো প্রকার প্রয়োজন ছাড়াই হাতকে হাঁটার সময় পা'কে সহযোগিতা করতে জোর করে; কিংবা চোখের ব্যাপারে আফসোস করে, কারণ সে শুনতে পায় না। আবার কানের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে

দেখতে না পারার কারণে। এভাবে সে মূলত নিজের অঙ্গগুলোকে উন্মাদনার দিকে ঠেলে দেয়। এটাকে জ্ঞানীরা পাগলামি ছাড়া কিছুই বলবে না।"

নারীর কর্মের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান মানব-প্রকৃতি, নারীর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বণ্টননীতির সাথে পরিপূর্ণ উপযোগী ও নিরাপত্তাশীল।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের মতে, অধিকহারে নারীদের কর্মক্ষেত্রে যোগদান উন্নতি ও আধুনিকতার নিদর্শন। অপরদিকে কর্মক্ষেত্র থেকে নারীদের দূরে রাখার অর্থ হচ্ছে দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে অকেজো করে রাখা।

এজন্য র‍্যান্ড কর্পোরেশন মুসলিম নারীদের অধিকহারে চাকরির বাজারে নিয়ে আসা এবং তাদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়ার প্রতি আগ্রহী। তবে মূল বাস্তবতা হলো, সংস্থাটির আগ্রহের জায়গা এটা না যে, নারীরা কাজ করুক এবং সম্মানজনক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে তুলুক; বরং অধিকহারে নারীরা কর্মক্ষেত্রে আসার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজে যেসব প্রভাব ও পশ্চিমা স্বার্থের বিস্তার দেখা যায়, সেগুলোই তাদের মূল আগ্রহের জায়গা। এজন্য সংস্থাটির কাছে 'নারীরা কাজ করছে' এই বাস্তবতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা কী কাজ করছে, কোন সেক্টরে কাজ করছে এবং কেমন পরিবেশে কাজ করছে।

_________★★★_________

মুসলিম নারীদের পশ্চিমাদের কাতারে নেওয়ার জন্য আকর্ষণ করা

পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম-সমাজের এমন একটি উপাদান তালাশ করে, যা খুব দ্রুত তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করে নেবে। তারা দেখতে পেল, নারীরাই হলো সেই সহজ ও দ্রুতগামী উপাদান। এজন্য তারা মুসলিম দেশগুলোর নারীসমাজকে টার্গেট করল। যেন তৃণমূল পর্যায়ে নারীরা তাদের সহযোগী হতে পারে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের পুরোনো এক রিপোর্টে আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের উপনিবেশ নিয়ে আলোচনা করেছে। রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছিল ডেভিড গ্যালোলা।১২০ সে ফ্রান্স উপনিবেশের একজন দায়িত্বশীল ছিল। আলজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নারী এবং আলজেরিয়ার অধিবাসীদের মাঝে থাকা তাদের মিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সে বলে, 'আমি বিশ্বাস করি, আলজেরিয়ার নারীরা যেই অনুগত জীবনযাপন করছে, আমরা যদি তাদের সেই জায়গা থেকে মুক্ত করতে পারি, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তারা আমাদের পক্ষে কাজ করবে। আমি সেনাবাহিনীর কমান্ডের কাছে একটি চিঠি লিখেছি। সেখানে আমি তাকে বলেছি, আলজেরিয়ান নারীরাই আমাদের সবচেয়ে প্রত্যাশিত সহযোগী। ১৬

নারীদের সহযোগিতা লাভের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন পলিসি দেখিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো, নারীদের পুরুষদের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া এবং নারী ও পুরুষের মাঝে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা। পরস্পরের প্রতি এই বিরোধী মনোভাব তৈরি করতে পারলে খুব সহজেই নারীদের তারা নিজেদের দিকে ঝোঁকাতে পারবে।১৯

ঠিক এই পরিস্থিতিটাই আজকে আমরা সমাজে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। নারী-পুরুষ একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক না ভেবে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজ থেকে এই ঘৃণ্য মনোভাবকে দূর করতে হবে। এই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ একদিকে কিছু পুরুষদের ব্রাহ্মণীবাদী আচরণ নারীদের জুলুমানা মানসিকতায় ভোগাচ্ছে। আর অন্যদিকে তাদের এই বিষণ্ণতার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমা নারীবাদী ও লিবারেল গ্রুপগুলো নারীদের দীনবিরোধী আদর্শের শিকার বানাচ্ছে।

নারীদের সহযোগী বানানোর ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদীদের আরেকটি পলিসি হলো, নারীদের বিভিন্ন সামাজিক ও চিকিৎসাকেন্দ্রিক সেবা প্রদান করা। এই ব্যাপারে ডেভিড গ্যালোলার অভিমত হলো, ফ্রান্সের একজন সেনাবাহিনী আলজেরিয়ার কোনো এক গ্রামের একজন বিধবা মহিলাকে খাবার দেয়। যার ফলে ওই নারী উক্ত গ্রামে আমাদের গুপ্ত সহযোগী হয়ে যায় এবং সে অনেক গুরুপূর্ণ তথ্য প্রদান ও গোপনীয় অনেক কাজ আমাদের করে দেয়।১২৭

র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের নারী-সংক্রান্ত রিপোর্টটিতে বলেছে, আফগানিস্তানে নারীদের কিছু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান আঞ্চলিকভাবে আমেরিকার জন্য বিভিন্ন সহায়তা লাভের ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। একাধিকবার সেবা গ্রহণকারী নারীরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে এবং আমেরিকান শক্তিকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে তারা নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করেছে। তাদের কেউ কেউ আমাদের কাছে বিভিন্ন কৌশলগত তথ্যও শেয়ার করেছে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমাদের সামনে যে বিষয়টি ফুটে ওঠে সেটা হলো, বর্তমানে পুরো মুসলিম-সমাজ (এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে) বিশেষত নারীসমাজের মাঝে ওয়ালা-বারা তথা আল্লাহর জন্য সম্পর্ক এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কচ্ছেদ-এর বিশ্বাস অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। আমরা যদি মুসলিম-সমাজে আকিদার এই পাঠকে শক্তিশালী করতে পারতাম, তবে পশ্চিমারা মুসলিমদের মাঝে প্রবেশের জন্য সহজ কোনো দরজা খুঁজে পেত না এবং মুসলিমদের মাঝে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ফাসাদ ছড়ানোর সুযোগও পেত না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাকো, তবে আমার শত্রুকে এবং তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে। অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসুলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণে (মক্কা হতে) বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো! অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে করো এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করো, আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হলো।সুরা মমতাহিনা, আয়াত ১

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

'হে মুমিনগণ! ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদের হেদায়াত দান করেন না।সুরা মায়েদা, আয়াত ৫১

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

'আল্লাহ তোমাদের কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদের বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা জালেম। 'সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ৯

আল্লাহর জন্যই আন্তরিক সম্পর্ক এবং আল্লাহর জন্যই সেই সম্পর্কচ্ছেদের বিশ্বাস মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পশ্চিমাদের সর্বপ্রকার আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য এক শক্তিশালী প্রাচীর হতে পারে। কারণ যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দীনের কল্যাণের ভিত্তিতেই সম্পর্ক করবে, সে কখনো ইসলামের শত্রুকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহায়তা করার মতো জঘন্য খেয়ানত করতে পারে না। যে কাফের, মুশরিক ও দীনের শত্রুদের প্রতি আন্তরিক সম্পর্ক রাখবে না, সে কখনো এমন কোনো বিষয় ও ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করবে না, যেটা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতির কারণ হবে। বারাআতের বিশ্বাস তাকে এই কাজ করতে বাধা দেবে।

________★★★_______

হিজাবের প্রতি র‍্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা ও মুসলিমদের দায়িত্ব

ওপরের আলোচনা থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়, নারী-স্বাধীনতা একটি পশ্চিমা রাজনৈতিক পরিভাষা। যাকে পশ্চিমাদের সার্থ অনুযায়ী ব্যাবহার ও ব্যাখ্যা করা হয়। তারা যেটাকে স্বাধীনতা মনে করবে সেটাই স্বাধীনতা, যদিও সেটা নারীর ইচ্ছা ও আগ্রহের বিরুদ্ধে যায়। আবার তারা যেটাকে স্বাধীনতার বিরোধী মনে করবে, সেটাই স্বাধীনতার পরিপন্থি হিসেবে বিবেচিত হবে। চাই নারীরা সেটা যত আগ্রহ ও সন্তুষ্টির সাথে কামনা করুক না কেন।

মূলত মুসলিম নারী সম্পর্কে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা নতুন কোনো বিষয় নয়। এমন না যে, তারাই প্রথম মুসলিম নারীদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। উপনিবেশবাদীরা মুসলিম দেশগুলোতে দখলদারিত্ব ও লুটপাট চালানোর সময় মুসলিমদের ওপর তাদের উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার সিলসিলা তৈরি করে গেছে। যা বর্তমানে বিভিন্ন নামে ও স্লোগানে চলমান আছে।

মিশরে ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে ১৮৯৪ সালে সর্বপ্রথম একটি বই প্রকাশিত হয়। যার নাম ছিল 'আল মারআতু ফিশ শারকি' তথা প্রাচ্যের নারী। বইটির লেখকের নাম মার্ক ফাহমি। লেখক বইটিতে ইসলামি শরিয়াহর ওপর নোংরা আক্রমণ চালায় এবং নারীদের ইসলামি শরিয়াহ থেকে মুক্ত হবার আহবান জানায়। এমনিভাবে উপনিবেশ আমলের কাসিম আমিন, হুদা শারাওয়িরাও এই একই ভূমিকা পালন করে। উপনিবেশ আমলের তৈরি করা সেই সিলসিলা আধুনিক বিভিন্ন কাঠামোতে আজও কাজ করে যাচ্ছে। বইয়ের শুরুতে আমরা বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরে ধরেছি।

ইসলামি শরিয়াহ গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষের মাঝে নৈতিক কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যা মূলত নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মানই রক্ষা করে। পাশাপাশি সমাজকে নৈতিক অধঃপতন ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। স্বভাবজাত হায়াকে বজায় রাখা, হিজাবের পাবন্দ করা, দৃষ্টি অবনত রাখা, সাধারণত ঘরেই অবস্থান করা, ফ্রি-মিক্সিং-এ না জড়ানো, নিম্নস্বরে কথা বলা, মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর না করা, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া, হারাম রিলেশনে না জড়ানো-এই সবগুলো ব্যাপার নৈতিকতার রক্ষাকবচ।
পশ্চিমারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এই সুরক্ষা কবচগুলো ভেঙে দিতে। যেন তারা মুসলিমদের ওপর সর্বদা নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে।
ব্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্ট তৈরিকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন গবেষক হলো শেরল বেনার্ড। যে একজন ইহুদি নারী। মুসলিম নারীর পর্দার বিরুদ্ধে ইহুদিদের শত্রুতা অনেক পুরোনো। এই ইহুদিদের একজন বনু কাইনকার বাজারে আমাদের এক বোনকে বেপর্দা করে

সম্ভ্রমহানি করেছিল। এই সম্ভ্রমহানি আঘাত হেনেছিল একজন সাহাবির আত্মমর্যাদায়। অভিশপ্ত সেই ইহুদিকে রাসুলের সাহাবি সেখানেই হত্যা করে ছিলেন এবং তিনি নিজেও ইহুদিদের হাতে শাহাদাতবরণ কারছিলেন।

পর্দা ইসলামি শরিয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কিতাবে এর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মোবারক হাদিসে এর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসুলের যুগ থেকেই মুসলিম নারীরা পর্দার বিধান পালন করে আসছিলেন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যস্বরূপ। বর্তমান সময়ে মুসলিম নারীদের জন্য জরুরি হলো, বিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যমূলক মতের ব্যাপারে সচেতন থাকা। পশ্চিমাদের কথায় কিংবা তাদের অনুসারীদের বক্তব্যে নিজের দীনের ব্যাপারে প্রতারিত না হওয়া, হীনম্মন্যতায় না ভোগা; বরং নিজের ভেতর এবং আশপাশের মুসলিম বোনদের ভেতর পর্দার গুরুত্ব রোপন করা। এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, হিজাব মহান রবের দেওয়া এক আবশ্যকীয় বিধান, যার পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ রয়েছে।

হিজাবের বন্ধন ও চেতনা থেকে ছিন্ন হওয়া অনেক বড় একটি গুনাহ। যা একই সাথে আরও অনেকগুলো বড় বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যেমন শরীরের কোনো অঙ্গকে প্রকাশ করা, দেহে সাজ-সজ্জার মাধ্যমে কৃত্রিম সৌন্দর্য প্রকাশ করা, অন্যকে ফিতনায় ফেলা। নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন ও অবাধ চলাফেরা সামাজিক অধঃপতনকে তরান্বিত করে এবং আল্লাহর শাস্তিকে দুনিয়ায় নামিয়ে আনে। আর পরকালে এই ধরনের নারীরা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। হিজাব কেবল কোনো চয়েজের বিষয় নয়, এটি মহান আল্লাহর তাআলার দেওয়া আবশ্যকীয় বিধান। হিজাব কোনো প্রতীকী বিষয়ও নয়, এটি মহান আল্লাহর প্রতি আমাদের নিঃশর্ত আনুগত্য ও দাসত্বের নিদর্শন। হিজাব আমাদের আকিদা ও ইবাদাহ। হিজাব যখন মুসলিম নারীদের আকিদা, তখন কেউ তাদের এই আকিদার বন্ধন থেকে ছিন্ন করতে পারে না। হিজাব যদি মুসলিম নারীর জন্য মহান রবের আনুগত্য হয়, তাহলে কেউ তাকে আনুগত্যের রশ্মির ব্যাপারে প্রতারিত করতে পারে না।

_________★★★________

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

এ পর্যন্ত পৌঁছতে আমাকে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল-জীবন মানে নারী ও পুরুষের প্রতিযোগিতা। এভাবে ভাবতে ভাবতে আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সবসময় আমার ভাবনায় থাকত, আমাকে পুরুষদের সমকক্ষ হতে হবে এবং তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করতে হবে সবার সামনে। নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমি সবসময় হীনম্মন্যতায় ভুগছিলাম। একটি কল্পিত যুদ্ধে নিজেকে অবতীর্ণ করে আমি বেশ পরিশ্রান্ত ছিলাম। এমন যুদ্ধ, যেখানে কোনো জয় পরাজয় নেই। এমন আগ্রাসী যুদ্ধ, যা আমাকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছিল। আমার আরাম ও প্রশান্তি ছিনিয়ে নিচ্ছিল। ঠিক সে ব্যক্তির মতো, যে একটি গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় তার জানা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর জীবনে প্রথমবারের মতো আমি পরিবার ও বাসা থেকে দূরে অবস্থান করতে শুরু করলাম। আমার লক্ষ্য ছিল, বহু মানুষের পদচিহ্নের ভিড়ে যেন নিজের পদচিহ্নটা খুঁজে বের করতে পারি। একটি বিশেষ অবস্থান আমি নিজের জন্য তৈরি করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু অতীতের অনেক কিছুই আমার পিছু ত্যাগ করছিল না। বিশেষত কুরআনের যে অংশটুকু আমি পড়েছিলাম সেটি আমার মস্তিষ্কে একটি নতুন ছক তৈরি করে দিয়েছিল। কথাগুলো আমার খুব ভালো লেগেছিল, আলহামদুলিল্লাহ। এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, কুরআনের পাতা থেকেই আমি আমার শান্তি খুঁজে নেব।

আমি অসুস্থ আত্মা নিয়ে আবারও কুরআন পাঠ করতে বসলাম। আমার আত্মা এই লড়াই ও প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তি চায়। কোনোরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই আমি সুরা মায়েদা খুলে ফেললাম। ৪৮ নম্বর আয়াতটা আমার চোখে পড়ল:

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اتَكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُوْنَ

'আর আমি আপনার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ। যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকে সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর সংরক্ষক। সুতরাং আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করুন আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দিয়ে। আপনার নিকট যে সত্য আগমন করেছে তার পরিবর্তে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি পৃথক শরিয়ত ও কর্মপন্থা। আর আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তোমাদের এক জাতি করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের প্রদত্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং

তোমরা উত্তম কর্মে প্রতিযোগিতা করো। মহান আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে সে বিষয়ে তিনি তোমাদের ফয়সালা জানিয়ে দেবেন।' [সুরা মায়েদা, আয়াত ৪৮]

এই আয়াতে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্যের কথা সরাসরি বলা হয়নি। কথাটি ব্যাপকভাবে জগতের সবাইকে বলা হয়েছে। যখন আমি আয়াতটি পাঠ করেছি তখন অনুভব করেছি যে, তা আমার সামনে এমন একটি মর্ম উদ্ভাসিত করে দিয়েছে, যা আমার মাঝে পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। এমন একটি মর্ম আমি অনুধাবন করলাম, যা আমার মানদণ্ড বদলে দিল। আমাকে পেরেশানির সংকীর্ণতা থেকে বের করে প্রশান্তির প্রশস্ততার দিকে নিয়ে এল।

এই আয়াতের প্রতিটি বাক্য ও প্রতিটি বর্ণকে আমি ভালোবেসে ফেললাম। প্রতিটি অংশ আমার ভেতরে গভীরভাবে জায়গা করে নিল। প্রতিটি বর্ণ যেন আমাকেই সম্বোধন করছিল। অথচ এই আয়াতটি আমি আগেও পাঠ করেছি। কিন্তু মনে হলো, এ যেন প্রথমবার পাঠ করলাম। আর কেনইবা এমন অনুভূতি হবে না? এটি তো আমার ওপর থেকে অস্থিরতার চাদর তুলে নিয়েছে। বাস্তবতাকে আমার সম্মুখে তুলে ধরেছে। আমি কোনো প্রকার বিকৃতি ও কপটতা ছাড়াই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারছি।

আমি এ আয়াত থেকে মোট সাতটি শিক্ষা লাভ করেছি। সেগুলো হলো:
এক. আপনার সামনে যা কিছু উপস্থাপন করা হচ্ছে সেগুলো আপনি কীভাবে বিচার করবেন? উক্ত আয়াতে যেকোনো বিষয়কে বিচার করার দুটি পন্থা দেখানো হয়েছে। হয়তো তা মহান আল্লাহর পবিত্র কিতাবে অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করা হবে। অথবা প্রবৃত্তি ও চাহিদা অনুসারে বিচার করা হবে। এ বিষয়টি আপনার সামনে দুটি পথ খুলে দেবে। হয়তো সত্য, নতুবা প্রবৃত্তি। এজন্যই মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্যের পথ অনুসরণ করতে বলেছেন।
দুই. সচেতন অনুসরণ নাকি অন্ধ অনুকরণ?
আয়াতের শুরুতেই মহান আল্লাহ আমাদের দুটি বিষয়ের আদেশ করেছেন। একটি ইতিবাচক আরেকটি নেতিবাচক। প্রথমে বলেছেন, ফয়সালা করুন। পরেই বলেছেন, অনুসরণ করবেন না। এ বিষয়টি আমাকে এ কথা বলতে বাধ্য করেছে যে, কোনো সমস্যা বা জটিলতার সমাধান করা হবে হয়তো সে বিষয়টির বাস্তবতা বিবেচনা করে গভীর চিন্তার মাধ্যমে। তখন সুন্দর সমাধান বেরিয়ে আসবে; নতুবা অন্যের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে হবে, যারা আমাদেরকে কথা ও কাজের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করে তুলবে।
আমার মনে হলো, আমি দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সমাজের প্রচলন আমার সামনে যা কিছু তুলে ধরত আমি তার অনুসরণ করতাম। সেখান থেকেই আমি আমার সিদ্ধান্ত নিতাম।

আমার কীভাবে চিন্তা করা উচিত? কী পোশাক পরা উচিত? কেমন হওয়া উচিত? তা আমি সমাজ থেকে গ্রহণ করতাম।

'নারী' খারাপ বিষয়, 'পুরুষ' ভালো বিষয়, এই চিন্তাটি শুরুতে আমার মাথায় ছিল না; কিন্তু আমি যখন প্রচলিত সংস্কৃতিকে নিজের মানদণ্ড বানিয়ে নিয়েছি তখন নিজে থেকে এটিকে মস্তিষ্কে জায়গা দিয়েছি। মূলত তা ছিল নারীবাদের প্রভাব। আমি শুধুমাত্র নারীবাদ অনুসরণ করেছি ও কষ্ট পেয়েছি। তাই আমার চোখ দুটি খুলে দেওয়ার জন্য কারও আগমনের প্রয়োজন ছিল। মহান আল্লাহর পবিত্র কালাম তখন আমার জীবনের ত্রাণকর্তা হয়ে এল।

তিন. ইচ্ছাকৃত পার্থক্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরিয়ত ও কর্মপন্থা।' আমি সবসময় ভাবতাম, মানবজাতির মাঝে নারী হলো পুরুষের দুর্বল ও নিম্নস্তরের সংস্করণ। কোনো বিষয়ের সফলতা যাচাই করার জন্য আমি পুরুষদের মানদণ্ড ও দৃষ্টান্ত মনে করতাম। ভাবতাম, যদি সম্মানের জীবন চাই তাহলে আমাকে তাদের মতো হতে হবে। তারাই হলো মূল, আমরা হলাম অনুসারী।

উক্ত আয়াতটি আমার ভেতর থেকে এ ধরনের সকল চিন্তাভাবনাকে বিদূরিত করল এবং বিচূর্ণ করে দিল। মহান আল্লাহ উত্তম সৃষ্টিকর্তা,তিনিই পার্থক্যের নীতি অবলম্বন করেছেন। জীবনের মূলনীতি হলো, বিভিন্ন সংস্করণের বস্তু পাওয়া যাবে। প্রত্যেকের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন শরিয়ত ও কর্মপন্থা থাকবে। প্রত্যেকের জন্যই বিশেষ গ্রন্থ থাকবে। যদি একজন অপরের গ্রন্থকে নিজের গ্রন্থের সঙ্গে মেলাতে যায়, তাহলে তা হবে বিকৃতি ও বাড়াবাড়ি। তা হবে মহান আল্লাহর নীতিকে লঙ্ঘন করার নামান্তর।

চার. কিন্তু কেন এই পার্থক্য?

মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের এক জাতি বানিয়ে দিতে পারতেন।'

তিনি যদি চাইতেন তাহলে নারী ও পুরুষকে একই রকম সৃষ্টি করতে পারতেন। গোটা মানবজাতিকে হয়তো নারী অথবা পুরুষ বানিয়ে সৃষ্টি করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমরা এমনই পৃথক হব। কিন্তু এর পেছনে রহস্য কী? কেন আল্লাহ এক রকম বানাননি?

পাঁচ. রহস্য।

উত্তর পরক্ষণেই মিলবে, 'যাতে তিনি তোমাদের প্রদত্ত বিষয়ে পরীক্ষা করতে পারেন।'

আয়াতের এই অংশটি আমার হৃদয়ের সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল। আমি যখন এই অংশটুকু পাঠ করেছি, সাথে সাথে আমার অন্তর প্রশান্ত হয়ে গেছে। সব সংশয় ও আপত্তি দূর হয়ে গেছে। পুরো গল্প ও তার প্রেক্ষাপটের একই লক্ষ্য। তা হলো-পরীক্ষা করা।
প্রত্যেক সৃষ্টিরই ভিন্ন পরীক্ষা রয়েছে। কারও পক্ষে তা থেকে বের হওয়া বা পলায়ন করা সম্ভব নয়। আমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে এবং যা কিছু থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সবই এই পরীক্ষার অংশ।
যখন এই মর্মটি আমার হৃদয়ে স্থির হলো তখন আমার নিজের অবস্থান বদলে গেল। জীবন সম্পর্কে আমার সামগ্রিক ও বিস্তারিত মূল্যায়নও বদলে গেল। এই মর্মটি আমাকে স্থিরতা ও শান্তি দান করল। আমি বুঝতে পারলাম, সবকিছুর মূলে একটিই কথা। আর তা হলো 'পরীক্ষা'।

ছয়. কীভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব?
আমি যখন জানতে পারলাম যে, আমি পরীক্ষার সম্মুখীন তখন আমার প্রশ্ন ছিল-কীভাবে আমি এই পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উতরে যাব? জবাব এল-'তোমরা উত্তম কর্মে প্রতিযোগিতা করো।'
উত্তম কর্ম। একটি ব্যাপক শব্দ। এখানে সুস্পষ্ট করে কোনো কিছুর কথা বলা নেই। আমি আমার পূর্বের সব মূলনীতি ও চিন্তাভাবনাকে পরিত্যাগ করলাম। পুরুষের প্রতি যে বিদ্বেষ আমি বছরের পর বছর লালন করে এসেছি তা দূর করার চেষ্টা করলাম। যেসব বিষয় আমাকে নারীসুলভ স্বভাব দূর করা, অনুভূতি গোপন করা ও বৈশিষ্ট্যকে ঘৃণা করা শিখিয়েছিল, সেগুলো চিহ্নিত করতে শুরু করলাম। আসলে আমি এসব বিষয় নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করতে চাইনি; বরং আমি সমতা নামক যে আরশে আসীন হতে চেয়েছিলাম তা আমাকে এসবে উদ্বুদ্ধ করেছে।

এসব চিন্তাভাবনা ছিল আমার অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। সবগুলো ছিল বিভ্রান্তিকর, বিরক্তিকর, অযৌক্তিক, অসম্ভব ও অকেজো চিন্তাভাবনা। কুরআন আমার হৃদয় থেকে এ বোঝা নামিয়ে দিল। আমি যেন শুনতে পেলাম নতুন জীবনের আহ্বান। আমাকে যেন বলা হলো-এ সবকিছু তুমি তোমার জীবন থেকে ছুঁড়ে ফেলো। শুধু তা-ই করো, যার জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তুমি শুধু তোমার পরীক্ষায় মনোযোগ দাও। তোমাকে যে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে তার জবাব তৈরি করো। ওসব চিন্তাভাবনা দিয়ে তোমার কী হবে? নিজের প্রতি দয়া করো।

সাত. সমাপ্তি।
'মহান আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।'
এই বাক্যটি ছিল আমার হৃদয়ে বসন্তের মতো। আমার দেহে যা আত্মার সঞ্চার করেছিল। আমাকে এমন এক প্রশান্তির অনুভূতি দিয়েছিল, যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক পরীক্ষারই উত্তরপত্র থাকে এবং ফলাফল থাকে, যা পরীক্ষার পর দেওয়া হয়। আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমন। পরীক্ষা শেষে আমরা সকলে সর্বমহান সত্তার নিকট একত্রিত হব। সেখানে আমরা প্রত্যেকেই নিজের কর্মকে উপস্থিত দেখতে পাব।

আমার সব দায়বদ্ধতা আমার মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি। যার মাঝে পুরুষের কোনো অবস্থান নেই। আমার কর্মের মূল্যায়ন, যথার্থতা তিনি যাচাই করবেন। আমি তাঁর আহ্বানে কতটুকু সাঁড়া দিয়েছি, তার ফয়সালায় কতটুকু আত্মসমর্পণ করেছি তা তিনিই বিচার করবেন। এসব বিষয় শুধু তাঁর ও আমার মাঝে সংঘটিত হবে। যেখানে কোনো তৃতীয়পক্ষ থাকবে না।

আয়াতের শেষে 'তোমরা যা নিয়ে মতভেদ করতে' কথাটি রয়েছে। আমি প্রশান্ত হয়ে গেলাম। সব দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তা দূর হয়ে গেল। প্রকৃত সত্যটা আমি আমার মহান রবের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

সুরা মায়েদার ৪৮ নং আয়াতটি আমি কখনোই ভুলতে পারব না। তার হৃদস্পর্শী মর্মকে আমি কখনোই ভুলে থাকতে পারব না। এ আয়াতটি আমাকে জীবনের নতুন অর্থ দান করেছে। প্রচণ্ড পিপাসায় আমাকে পানি পান করিয়েছে।

বহুবার এই আয়াতটি আমি পাঠ করেছি। কুরআন বন্ধ করে তার মর্মগুলো আমার মাথায় স্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তারপর আবার কুরআন খুলে আয়াতটি পুনরায় পাঠ করেছি। নিজেকে বলেছি, যে প্রশ্নের উত্তর তুমি বহু বছর খুঁজে বেড়িয়েছ, তা তোমার সামনেই রয়েছে। তুমি চাইলেই এখন তা পাঠ করতে পারো। আলহামদুলিল্লাহ।

এসব অনর্থক বিতর্কের কোনো ভিত্তি নেই। এগুলো অযথাই আমার মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রেখেছে। আমি নিজেই নিজেকে কষ্ট দিয়েছি। বিকৃত সমাজব্যবস্থা ও নারীবাদের বিষ আমাকে এই অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছে। নারীবাদ আমাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। জীবনের দীর্ঘসময় মরীচিকার পেছনে ছোটার পর কুরআনের ছায়ায় এসে আমি প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান পেয়েছি।

এই ছিল আমার পরিবর্তনের যাত্রার সূচনা। আমার মনে হচ্ছিল, এসব বিষ থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হতে আমার আরও কয়েক বছর সময় লাগবে। কারণ খারাপ অভ্যাসগুলো সহজে দূর হতে চায় না।(এই টপিকটি বই থেকে হুবহু কপি করা)

_______★★★______

বাচাও জীবনগুলো,বাচাও চেতনা

আগে আগে বিয়ে করার মতো অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে লিখেছিলাম কয়দিন পূর্বে। বলেছিলাম এটি সব রকম যিনা-ব্যভিচার, পাপ, সামাজিক বিকৃতি থেকে বাঁচার উপায়।
এই সোজাসাপ্টা কথার বিপরীতে কিছু মানুষের বক্তব্য দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমি।
এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু কথা বলার খুব প্রয়োজন।

মুসলিম বাবা-মা হিসেবে আমাদের উচিত তরুণ-তরুণীদের জন্য দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করা, যাতে বাবা-মায়ের অজান্তে তাদের গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ডেটে যেতে না হয়। কিংবা দেওয়া না লাগে মিথ্যা অজুহাত। যেন পর্ন-আসক্ত না হয় তারা।
হালালের বাড়তি মানেই হারামের ঘাটতি। সোজা হিসাব!
অথচ এই সোজা জিনিসের ব্যাপারে কিছু লোকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলি।
"না, তাদের উচিত হস্তমৈথুন করা।"
কী অদ্ভুত! একজন মুসলিম ভাই সরাসরি এই কথা বলছে।
আরেক বোন বলল, "পুরুষদের উচিত দৃষ্টি সংযত রাখা। আর কিছু আলিম তো সাময়িক সমাধান হিসেবে হস্তমৈথুন করার অনুমতি দিয়েছেনই। এটি অভ্যাসে পরিণত না হলেই হলো। সহজ বিষয়।"
সত্যি? এতই সহজ? আমরা এসব কী বলছি!
যা-ই হোক, আরও ভয়ানক কিছু মানুষের কিছু ভয়ানক কথা শুনে নিই।
"তালাক ব্যভিচারের চেয়েও খারাপ।"
"বিয়ে যিনাকে প্রতিরোধ করতে পারে না।"
"বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু যৌনকামনা পূরণ করা নয়।"
"যা সহজে আসে, তা সহজে চলেও যায়। খুব সহজেই যা পাওয়া যায়, তার কদর করা হয় না।"
"তাহলে বাচ্চা-কাচ্চা?"
"কৈশোরের শেষ পর্যায়ে থাকা তরুণরা মানসিকভাবে পরিপক্ব নয়। যোগাযোগ দক্ষতাও ভালো না তাদের।"
"তাদের আগে নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত।"
"এই সমাধানটি খুব সরলীকৃত ও কাল্পনিক।"
"বিয়ে শৈশব কেড়ে নেয়।"
"সংসার কীভাবে চলবে?"
"পুরোনো ইসলামী সংস্কৃতিচর্চা আমাদের আধুনিক সময়ের জন্য অবাস্তব। তা ছাড়া অতীতের ভাবালুতা আজকের তরুণদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।"

"নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা প্রয়োজন।"
"এতে সমাজের কথাকে তোয়াক্কা না করার মানসিকতা তৈরি হয়।"
"বিশ-বাইশ বছর বয়সে তো মানুষ নিজেকেই ঠিকমতো চেনে না। পরে অনেক পরিবর্তনও আসতে পারে।"
"এর পরিবর্তে আমাদের উচিত সন্তানদের নিজেরা সামাল দেওয়া। সংযত হতে শেখানো। যেমন, নিজেকে সংযত না করতে পারলেই ধর্ষণের মতো অপরাধ ঘটে। বৈবাহিক ধর্ষণও এর অন্তর্ভুক্ত।"
"যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা আসলে বেশ সহজ।"
"বিয়ে কোনো সমাধানই না। বিকৃত যৌনতার লোকেরা বিবাহিত অবস্থায়ও যৌনবিকৃতিই প্রকাশ করবে।"
"বর্তমান সমাজকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণের (রা.) সমাজের সাথে মেলালে হবে না।"
"কোনো এক ছেলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বলে আমার মেয়ের কৈশোর নষ্ট করব নাকি!"
দ্বিমত পোষণ করার এই হলো বেশির ভাগ কারণ।
কিছু কথা জেনে নিন।

১. বিয়ে, যৌনতা এবং ব্যভিচার:

যিনা-ব্যভিচার এড়ানোর সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হলো বিয়ে। জি, এটাই সত্য। আমি বুঝি না কিছু মানুষ কীভাবে এই সহজ সত্যটিকে অস্বীকার করতে চায়।
বিবাহিত হয়েও প্রতারণা করে, এমন মানুষ আছে। এ রকমটা হয়। কিন্তু এতে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটির অকার্যকারিতা প্রমাণিত হয় না। ইসলাম বিয়েকে উৎসাহ দেয়, কারণ তা যিনা থেকে বিরত রাখে। এটি খুবই পুণ্যের কাজ এবং গুরুতর পাপ থেকে সুরক্ষাকারী।

২. হস্তমৈথুন প্রসঙ্গে:

হস্তমৈথুন কীভাবে সমাধান হতে পারে, আমি এখনো বিস্মিত।
আমার মনে হয় ভুলটা হচ্ছে এখানে। ব্যভিচারের চেয়ে যেহেতু হস্তমৈথুন ভালো, সেহেতু এখান থেকে উপসংহার টানা হয় তাড়াতাড়ি বিয়ে করার চেয়েও তা ভালো। এটা মিথ্যা। ইসলামকে চিন্তার মাপকাঠি বানিয়ে ভাবুন। হস্তমৈথুন এবং ব্যভিচার দুটোই পাপ। পাপের মাত্রা রয়েছে। যিনার শাস্তি 'হদ'। হস্তমৈথুনের এ রকম কোনো শাস্তি না থাকলেও এটি পাপ। তাড়াতাড়ি বিয়ে করা পাপ নয়।

৩. বিয়ে এবং বাচ্চা:

১৭-২২ বছরের মধ্যে বিয়ে করে ফেলতে বলি আমি। এর মানে এই নয় যে, দ্রুত সন্তানও নিয়ে নিতে হবে। বিয়ের পর সন্তান গ্রহণের জন্য সময় নেওয়াই যায়। বিয়ে মানেই হুট করে বাবা-মা হয়ে যাওয়া নয়।

৪. পরিপক্কতা এবং বিয়ের প্রস্তুতি:

দ্রুত বিয়ের পরামর্শ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। সন্তানতে বিয়েও দেব, সেই সাথে ধৈর্য ও তাকওয়ার মতো গুণাবলিও শেখাব। উপযুক্ত বৈবাহিক প্রশিক্ষণ, রাগ নিয়ন্ত্রণ, বোঝাপড়া, আবেগীয় এবং মানসিক দক্ষতা-বাদ যাবে না। কিছুই। প্রত্যেকটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা একটার কথা শুনলে আরেকটাকে বাদ মনে করেন কেন, বুঝলাম না!

কম বয়সে বিয়ের পরামর্শ দেওয়ার মানে এই না যে, বিয়েকে রসিকতা বা হালকা বিষয় বলে ভাবছি। এই বয়সেই গুরুত্ব এবং দায়িত্ব-প্রস্তুতি সহকারে বিয়ে করা যেতে পারে।

৫. ব্যভিচারের ভয়াবহতা:

ব্যভিচার একটি কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচার করতেই শুধু নিষেধ করেননি। এর কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন স্পষ্ট ও কঠোরভাবে।

. وَلَا تَقْرَبُوا الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। এটি লজ্জাজনক কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা। "সূরা আল-ইসরা, ৩২

বিভিন্ন ধরনের যিনার কথা হাদীস থেকে জানা যায়। চোখের যিনা, হাতের যিনা, পায়ের যিনা। বাস্তবতা হলো, যিনার সাথে আরও অনেক পাপের সম্পর্ক আছে। এমনি এমনি হয়ে যায় না এটি। ব্যভিচারের সূত্রপাত ঘটায় এমন কিছু পাপ আছে।

خلوة)খালওয়া বা নির্জনে একত্র হওয়া(, تبارز ও (তবারুজ বা নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন(, اختلاط( )ইখতিলাত বা অবাধ মেলামেশা), ফ্লার্টিং, সেক্সটিং, পর্ন, হস্তমৈথুন ইত্যাদির মাধ্যমে সূত্রপাত ঘটে যিনার।

মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে মারাত্মকভাবে। কিছু তরুণের পর্ন-আসক্তি থাকে, আবার কেউ হস্তমৈথুনে আসক্ত, কেউ-বা আসক্ত হারাম সম্পর্কে। কেন এসব হারামে জড়িয়ে যায় তারা? কারণ, তারা জানে যে, হালাল কিছুর অনুমতি পেতে তাদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে!

তাদের দ্রুত হালাল পন্থার ব্যবস্থা করে দিন। এই বোধটুকুই বদলে দেবে তাদের। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে আলো দেখে তারা পরিহার করবে অন্ধকার।

বিয়ে কঠিন করে ফেলা মানে তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া। তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়। শয়তান হয় উল্লসিত। তারা অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়। হস্তমৈথুন করে, পর্ন দেখে।

৬. যৌনকামনা: মেয়ে বনাম ছেলে

জগৎকে শুধু পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে দেখা ছাড়ুন। নারীদেরও একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, আছে আকাঙ্ক্ষা-বঞ্চনা।সংকীর্ণ দৃষ্টির লোকেরা ভাবে যে, বিয়েতে শুধু পুরুষদেরই লাভ। তাদের ধারণা কিশোরী-তরুণীদের কোনো যৌনকামনা নেই। কেবল ছেলেদেরই আছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।অনেক মেয়ের বয়ঃসন্ধির শুরু থেকেই প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা থাকে। এই মেয়েদের সহায়তা

করবে দ্রুত বিয়ে। শারীরিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তারা রক্ষা পাবে পাল থেকে। বিয়ে কোনো লোলুপ পুরুষের চাহিদা মেটানো আর নারী-নির্যাতনের সরঞ্জাম নয়।

প্রমাণ ছাড়া লোকে কেবল মুখের কথা বিশ্বাস করে না। ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেক মেয়েকে চিনি আমি। তাদের সাথে আমি কথা বলেছি, কাজ করেছি। তারা হয় ব্যভিচারের কাছে গিয়েছে, নয়তো এতে সরাসরি লিপ্ত হয়েছে।

পনেরো বছর বয়সি এক মুসলিম মেয়ে হাইস্কুলের ড্রামা ক্লাবে যোগ দিয়েছিল। কেন জানেন? যাতে এক অমুসলিম ছেলে সহপাঠীর সাথে দেখা করতে পারে। সময় কাটাতে পারে বাবা-মায়ের অজান্তে।

আমার পরিচিত এক মুসলিম মেয়ে ইচ্ছা করে বাসা থেকে দূরে এক কলেজে ভর্তি হয়। উদ্দেশ্য-অবাধে পার্টিতে যাওয়া ও যিনা করা। নারী এবং পুরুষ উভয়ের সাথেই যিনা করেছিল সে। মেয়েটা এতটাই উশৃঙ্খল হয়ে পড়ে যে, তার অমুসলিম বন্ধুরাও চিন্তিত হয়ে যায় তাকে নিয়ে।

এক অল্পবয়সি মুসলিম মেয়ে অমুসলিম আমেরিকান এক ছেলের সাথে গোপনে অনলাইনে টেক্সট করা শুরু করে। তার বয়স তখন ১৪ আর ছেলের ১৯। এখন তার বয়স ২১ এবং ছেলের বয়স ২৬। এখনো প্রতিদিন কথা হয় তাদের। সে তার অন্যান্য বিবাহিত ভাইবোনদের সাথে দেখা করার কথা বলে বের হয়। অথচ চলে যায় সেই ছেলের সাথে দেখা করতে অন্য স্টেটে। বাবা-মা কিছুই জানে না। সে ওই ছেলের সাথে বাইরে খাওয়া-দাওয়া করে, গাঁজা খায় আর চিল করে। যিনা যে খুব জঘন্য পাপ, এই বোধটুকু থাকায় যৌনসম্পর্ক স্থাপন করেনি। কিন্তু ওই সময়টুকু হিজাব খুলে রাখে সে। উগ্র পোশাক পরে।

এগুলো বাস্তবতা। আপনারাই বরং মানবসমাজকে চোখ খুলে দেখেন না। অতি-সরলীকৃত আর ভাবালু সমাধানের স্বপ্নে ডুবে আছেন আপনারাই।

দয়া করে চোখ-কান খুলুন। দেখার চেষ্টা করুন মুসলিম তরুণ-তরুণীদের জীবনের বাস্তবতা। লাগামহীন, উগ্র যৌনতা-বেষ্টিত এই সেক্যুলার সমাজে তারা কীভাবে বেঁচে-বর্তে আছে, দেখে আসুন।

কাল্পনিক সমাধানে ভেসে চলবেন না। হালকাভাবে নেবেন না যিনা ও হস্তমৈথুনের মতো ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো।

মুসলিম তরুণদের দয়া করুন!

বাঁচাও জীবনগুলো, বাঁচাও চেতনা!

________★★★________

নারীত্বের প্রয়োগ

শুরু করছি আমার পছন্দের একটি হাদীস দিয়ে। নারীবাদীরা আবার প্রচণ্ড ঘৃণা করে এই হাদীস।

আবু সাঈদ আল খুদরী এ বর্ণনা করেছেন, একদিন আল্লাহর রাসূল কোনো এক ঈদের সালাতে যাচ্ছিলেন। কিছু নারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের বললেন, "মহিলাগণ, বেশি করে দান-সদকা করো। দেখলাম যে, জাহান্নামের বেশির ভাগ অধিবাসীই তোমরা।"

তারা জিজ্ঞেস করলেন, "নবিজি, এটার কারণ কী?"

তিনি বললেন, "তোমরা অতিরিক্ত অভিশাপ দাও এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমাদের বুদ্ধিও কম, দ্বীনদারিও কম। অথচ বুদ্ধিমান পুরুষকে নির্বোধ বানাতে আর কাউকে তোমাদের চেয়ে পটু দেখিনি। "

মুসলিম ফেমিনিস্টরা অবশ্য এই সুন্দর হাদীসটির কথা শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। মনে করে হাদীসটা বুঝি "বিতর্কিত"। অথচ এটা সহীহ বুখারীর হাদীস। তারা আসলে হাদীসটির মূল বার্তাই বোঝেনি। এই হাদীসে নাকি নাবীদের ছোট করা হয়েছে।

বরং পুরুষত্বের ওপর নারীত্বের ক্ষমতার ইঙ্গিত দেখতে পাই আমরা এই হাদীসে। দেখতে পাই পুরুষের ওপর নারীর অবাধ ক্ষমতার স্বীকৃতি। নারীরা সাধারণত জনসম্মুখে এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম সক্রিয় থাকেন। শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও পুরুষের চেয়ে ছোট এবং দুর্বল।

একজন পুরুষ তার শক্তি বৃদ্ধি সত্ত্বেও কখনো নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিতে পারে যেমন রয়েছে আকাঙ্ক্ষা, তেমনি আছে প্রয়োজন। সেটা এত প্রবল হতে পারে যে, কোনো নারীর কাছে। যৌন আকর্ষণ এক অপ্রতিরোধ্য জিনিস। নারীর প্রতি পুরুষের এটি তার স্বাভাবিক বিচার-বৃদ্ধিও লোপ করে দিতে পারে। এমনকি ধীরস্থির স্বভাবের একটা পুরুষও বোকার মতো কাজ করে বসতে পারে কোনো নারীর জন্য। করতে পারে এমন কাজ, যা তার চরিত্রের সাথে একেবারেই যায় না।

এটা নারীদের এক অনন্য ও বিস্ময়কর ক্ষমতা!

মুগিস এবং বারীরার ঘটনায় ঠিক এ বিষয়টিই আমরা দেখতে পাই।

বিয়ের সময় বারীরা এবং মুগিস দুজনই ছিলেন দাস। বারীরা একসময় দাসত্ব থেকে মুক্ত হলেন, কিন্তু মুগিস রয়ে গেলেন আগের অবস্থাতেই। স্বাধীন নারীকে দাস বিয়ে করতে পারে না। তাই স্বাধীন হওয়ার পরে বারীরা চাইলে এই বৈবাহিক সম্পর্ক রাখতেও পারতেন, ছিন্নও করতে পারতেন। তিনি ছিন্ন করতে চাইলেন।

কিন্তু মুগিস তাকে এত ভালবাসতেন যে, একদমই মেনে নিতে পারেননি ব্যাপারটা। তিনি একেবারে জনসম্মুখে কেঁদে কেঁদে তার পিছু হাঁটতেন। অনুনয়-বিনয় করে বলতেন, "বারীরা, একবার তাকাও আমার দিকে। একটিবার কথা বলো।"

এমনকি সাহাবিদের গিয়ে বলতেন, "ওকে একটু আমার কথা বলেন না!" আবু বকর রা., উমর রা. এবং শেষমেশ রাসূল স্ত্রী-কেও বললেন সুপারিশ করতে।

তখন নবী করীম বারীরাকে বললেন, "ওর কাছে ফিরে গেলে হয় না?"

বারীরা বললেন, "আল্লাহর রাসূল, এটা কি আপনার আদেশ?"

তিনি বললেন, "আদেশ না। তার জন্য সুপারিশ করছি আরকি।"

বারীরা বললেন, "আমার তাকে প্রয়োজন নেই।"

রাসুল। আব্বাসকে বলেছিলেন, "বিষয়টা অদ্ভুত না, আব্বাস? মুগিস বারীরাকে কী ভালোবাসে! আর বারীরা মুগিসকে কতই-না ঘৃণা করে।"

ইবনে আব্বাস এই বর্ণনা করেন, "দৃশ্যটা যেন আজও আমার চোখে ভাসে। মুগিস বারীরার পেছনে ঘুরঘুর করতে করতে কাঁদছে। চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যাচ্ছে তার!

পুরুষদের ওপর নারীর এই ক্ষমতার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় 'লায়লা-মজনুর' গল্পে। আরবের সুপ্রাচীন উপকথা এটি।

মজনু কিন্তু তার আসল নাম নয়। তার নাম ছিল কায়স। সে লায়লার প্রেমে একেবারে দিওয়ানা হয়ে গেল। লায়লাকে বিয়ে করতে না পেরে পাগল হয়ে যায় সে। পরিচিতি লাভ করে "মাজনুন" বা "পাগল" নামে। এই পাগলামির কারণেই আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে সে।

তৃতীয় আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা। একজন যুবক একটি মেয়েকে পাওয়ার জন্য তার নিজ শহরের বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে সহযোগিতা করে।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এই ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি। তারা রোমান-অধিকৃত প্রধান শহর দামেস্কে একটি দীর্ঘ অবরোধ আরোপ করে রেখেছিলেন। শহরটিকে রোমান-প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে পারেনি। কঠোর নিরাপত্তা দিয়ে ধরে রেখেছিল রোমানরা। কয়েক মাস চেষ্টার পরও মুসলমানরা রোমান প্রতিরক্ষাবূহ বেদ করতে পারেনি।

একরাতে এক রোমান যুবক দামেস্কের ফটক পেরিয়ে আসে। খালিদের সাথে একটি গোপন বৈঠক করার অনুরোধ করে সে। যুবক খালিদকে প্রস্তাব দিল যে, সে মুসলমানদের শহরটি জয় করতে সাহায্য করবে। তবে একটি শর্তে। শর্তটি হলো মুসলমানরা শহর দখল করে নেওয়ার পরে খালিদ যেন যুবকের প্রেমিকাকে তার সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়। তাকে পাত্র হিসেবে নাকচ করে দিয়েছিলেন মেয়ের বাবা।

খালিদ তাকে দেন পালটা আরেকটি শর্ত। এই রোমান যুবককে খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হতে হবে। যুবকটি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায়।

পরিকল্পনাটি ভালোই ফলপ্রসূ হলো। ধর্মান্তরিত রোমান যুবক খালিদকে অবরোধ ভাঙতে সহায়তা করে। জয়লাভ করে মুসলমানরা। কিন্তু সেই মেয়েটি রোমানদের পরাজয়ের পরদিনই অন্য অনেকের মতো শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

হতাশ হয়ে যুবকটি আবারও গেলো খালিদের কাছে। খালিদ তখন বিশাল অঞ্চল দখল-পরবর্তী নানা কাজে ব্যস্ত। সেই যুবক তাকে পালিয়ে যাওয়া রোমানদের পিছু অধোওয়া করার অনুরোধ জানায়।

খালিদ অবাক হয়ে তাকালেন তার দিকে। বললেন, "আমি তাদের আক্রমণ করতে পারব না, যুবক। তাদের সাথে নিরাপত্তা-চুক্তি হয়েছে আমাদের।"

চুক্তিটি ছিল, যেসব রোমান দামেস্ক ছেড়ে চলে যেতে চায়, তাদের ওপর কোনো রকম আক্রমণ করা হবে না। তিন দিনের মধ্যে নিরাপদে শহর ছেড়ে চলে যেতে পারবে তারা।

তখন প্রেমিক যুবক অনুরোধ করল, তিন দিন পরেই ধাওয়া করা হোক। খালিদতে একটি শর্টকাট বাতলে দেয়ার প্রস্তাব করে সে।

অবশেষে রাজি হলেন খালিদ। মুসলিমরা পেয়েও গেল সেই পলাতক কাফেলাটিকে। কিন্তু যুবকটির মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা জানতে পেরে মেয়েটি তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে এবং আত্মহত্যা করে।

দেখলেন, নারী তার স্বভাবজাত কোমলতা দিয়ে কীভাবে প্রতাপশালী পুরুষকে কাবু করে ফেলে? আল্লাহই নারীদের দিয়েছেন এ ক্ষমতা।

এখন এই ক্ষমতা নিয়ে আমাদের কী করা উচিত?

ক্ষমতার সাথে আসে দায়িত্ব।

দুটি পরামর্শ দিচ্ছি:

নারীদের অবশ্যই তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে, যাতে এ ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়।

এ কারণেই আমরা পর্দা করি। নারী ও পুরুষের অবস্থান ও কর্মক্ষেত্র ভিন্ন, যদি না সত্যিকারের কোনো ব্যতিক্রমী প্রয়োজন দেখা দেয়। কথোপকথন করতে হলে সেটা হবে শ্রদ্ধা এবং হায়া সহকারে। নারীর পোশাক হতে হবে পর্দার বিধান অনুযায়ী এবং পুরুষের দৃষ্টি থাকবে অবনত। তাই বোনেরা, পর্দা রক্ষায় তৎপর থাকুন। স্বামী ছাড়া কারও প্রতি আপনার কমনীয়ত গরম না বা নারীত্ব প্রদর্শন করবেন না।

আর বাড়িতে স্বামীর ওপর এই ক্ষমতা ফলাবেন একদম লাগামহীনভাবে!

______★★★_______

বিয়ে

এক রাত বা এক সকালের ব্যবধানে নারীবাদের সব চিন্তাভাবনা আমার মাথা থেকে দূর হয়ে যাবে, এমনটি সম্ভব নয়। একজন তরুণ শিক্ষার্থী মুসলিম ছাত্রসংগঠনের তালিকা থেকে আমার বাবার নম্বর সংগ্রহ করে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলল। অনেকটা ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লাম। পূর্বের চিন্তাগুলো আবারও আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

নাহ, অসম্ভব। কীভাবে এই যুবক আমাকে বিয়ে করতে চায়? কেন বিয়ে করতে চায়? আমাকে কি সেইসব মেয়েদের মতো দেখা যায় যাদের বিয়ে করা যায়? আমি কি নিজের জীবন নিজেই পরিচালনা করতে সক্ষম নই? আমার কি কোনো পুরুষের সহায়তার প্রয়োজন আছে? মানুষ আমাকে কীভাবে দেখছে? আমার ব্যাপারে তাদের মাঝে কী প্রতিক্রিয়া ছড়িয়েছে? যে লোকটা বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে সে কী দেখে দিয়েছে?
আমি তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ে আমার মতো স্বনির্ভর নারীদের জন্য নয়। এটা দুর্বল ও অক্ষম নারীদের জন্য।

কিন্তু কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর অনুভব করলাম, যুবকটির প্রস্তাব এভাবে প্রত্যাখ্যান করাটা অন্যায় হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুনরায় ভাবতে শুরু করলাম। যখন সে বারবার প্রস্তাব নিয়ে আসছিল, তখন আমি তাকে সুযোগ দিলাম এবং আমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিলাম। অনেকবার চেষ্টার পর আমার মুখ থেকে সেই কাঙ্ক্ষিত 'হ্যাঁ' শব্দটি বের হলো। দুই পরিবার দীর্ঘদিন আলাপচারিতার পর আমার এই সম্মতি প্রকাশ পেয়েছিল। তবুও কিছু দুশ্চিন্তা ও সন্দেহ এ পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে বিচলিত করছিল। সত্যি বলতে, আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে, আমার অনুভূতি কী? এমন কেন হচ্ছে, তার কারণ কী? কেন আমার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এই অনাগ্রহ? এটা কি বিয়ের ব্যাপারে অনীহা, নাকি অন্যকিছু?

আল্লাহর রহমতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছর আমরা উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাম।

হ্যাঁ, আমি বিয়ে করেছি। আমার সব ব্যাচমেট যে পথে হেঁটেছে তার উলটো পথে হেঁটেছি। সবাইকে অবাক করে দিয়েছি। গতকাল যে মেয়ে বিয়ে-বিষয়ক সংস্থার বিরোধিতা করেছিল, আজ সে বিয়ে করেছে। বিষয়টা বেশ হাস্যকর ছিল। কীভাবে হঠাৎ সে বদলে গেল এবং নিজের চিন্তার বিরুদ্ধে অল্প বয়সেই বিয়ে করে ফেলল?
বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বছর অতিবাহিত করে আমি বের হলাম। সে এক নতুন জগৎ। আমার জন্য কোনো চাকুরি অপেক্ষা করছে না। ভবিষ্যতে কোনো উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনাও নেই।

কোনো চ্যারিটি কাজও নেই যে, তা উপভোগ করব। এখন আমাকে শুধু একজন 'স্ত্রী' হতে হবে। এরচেয়ে বেশি কিছু নয়।

আমার সহপাঠীদের কেউ কেউ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে। কেউ কেউ আইন অনুষদে ভর্তির আবেদন করেছে। কেউ কেউ আবার ওয়ালস্ট্রিট ও তার আশেপাশে বিভিন্ন চাকুরিতে যোগদান করেছে। আর আমিই হলাম একমাত্র মেয়ে, যে হার্ভার্ড থেকে গ্রাজুয়েশন করে গৃহিণীর কাজে যোগদান করেছি। হায় আমার সফলতা!

বিষয়টি আমার চিন্তাজগৎকে আঘাত করছিল এবং কিছুদিন আমাকে কষ্টে রেখেছিল। নারীত্ব ও তার বাস্তবতা সম্পর্কে আমার পুরোনো চিন্তাভাবনা, আমার মূল্যায়ন বারবার আমার কাছে ফিরে আসছিল। আমার মনে হলো, হার্ভার্ডের মূল্যবান ডিগ্রিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে আমি আসলে ভুল করছি। আমাদেরকে বলা হতো, এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর তোমরা বিরাট সফলতা লাভকরতে পারবে। বলা হতো, তোমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সবটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সমাজকে বদলাতে হবে। তোমরাই হবে আগামীর কর্ণধার। তোমরা তো হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েট!

কিন্তু আমি বিয়ে করে ফেললাম। হয়ে গেলাম আপাদমস্তক গৃহিণী। রান্না করি, ঝাড়ু দিই, ঘর গোছাই। এটাই আমার সবকিছু। এতটুকুই আমার দায়িত্ব, আমার কাজ। এটা কি বিরাট সফলতা? এটাই কি আমার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা? কী হবে আমার আবেগের? সমাজ পরিবর্তনে আমি কী করতে সক্ষম হলাম?
যখন কোনো সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত তখন খুব লজ্জায় পড়ে যেতাম। তারা স্বপ্নের দিকে পথ চলছে, গৌরবের পথে ছুটছে। যে স্বপ্ন একসময় আমি ছুঁয়ে দিতে চাইতাম, আজ তারা আমার সামনে তা স্পর্শ করছে। এক বান্ধবী এসে আমাকে তার সংস্থার পদবি সম্পর্কে জানাল। আরেক বান্ধবী তার উচ্চশিক্ষার সিলেবাস সম্পর্কে জানাল। ওদিকে আমি বসে আছি আমার ঘরে, চারদেয়ালের মাঝে। কিছুই করতে পারছি না। আমার এমন কিছু নেই যা তাদেরকে বলব।

বিষয়টি নিয়ে আমার স্বামী একাধিকবার স্থিরতা ও প্রজ্ঞার সাথে আলাপ করার চেষ্টা করেছে। অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, আমি যা ভাবছি এবং যে গণ্ডিতে নিজের চিন্তাভাবনাকে আবদ্ধ রাখছি তার বিপরীতে এমন দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যা অপেক্ষাকৃত বাস্তবসম্মত। তার কথায় আমি কিছুক্ষণ শান্তি পেতাম। তারপর আবারও আগের চিন্তায় ফিরে যেতাম। মনে হতো, আমার কোনো লক্ষ্য নেই, সফলতা নেই, শুধু গৃহিণী হয়ে থাকতে হবে সারা জীবন। আমার মাথায় ঢুকে গেল যে, আমি যে জীবন অতিবাহিত করছি তা কোনো সফল নারীর জীবন নয়।

যখন আমি নারীবাদী হইনি তখনো আমি গৃহিণী নারীদের অনেক আফসোস ও দয়ার দৃষ্টিতে দেখতাম।

বিয়ের প্রথম বছর আমি শিখলাম-কীভাবে ঘর পরিষ্কার রাখতে হয় এবং দেখাশোনা করতে হয়। আমি অনেকটা পরিচালকের দায়িত্ব পেয়ে গেলাম। বিশুদ্ধ আরবি ও তাজবিদ শেখার জন্য কিছু দারসে অংশগ্রহণ করলাম; কিন্তু তা যথেষ্ট মনে হচ্ছিল না। তারপর নারীদের জন্য বিশেষায়িত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি পরামর্শক হিসেবে কাজ শুরু করলাম। এই কাজটি আমার অনেক ভালো লাগল। কাজটিকে আমি ভালোবেসে ফেললাম। ছাত্রীরা আমাকে ভালোবাসতে শুরু করল। যদিও এটা সবকিছু ছিল না। কিন্তু কাজটি আমাকে এই অনুভূতি দিল যে, আমি নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারছি। তখন থেকে অনুভব করছি যে, আমার মাঝে স্বাভাবিক এক মানুষের জন্ম হয়েছে। আমি একজন সম্মানিতা নারী। যে স্বাবলম্বী, স্বামীর ওপর নির্ভরশীল নয়।

আমি বিবাহিতা ছিলাম। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং স্বাধীনতার জন্য নিজেই উপার্জন করার ইচ্ছে তখনো দমে যায়নি। আমি অসহায় ও অচল গৃহিণী হয়ে বাড়িতে বসে থাকতে চাইনি। ছোট বড় যেকোনো প্রয়োজনে কীভাবে আমি আমার স্বামীর কাছে হাত পাতব? অসম্ভব!

কিন্তু এভাবেই এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল না। একজন স্ত্রী হিসেবে আমি যখন নিজের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে গেলাম, তখন দ্রুতই আমার মাঝে পরিবর্তন এল। আর মা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়েও একই ঘটনা ঘটল।

________★★★________

নারীত্ব থেকে স্ত্রীত্ব

এতক্ষণ আমরা 'মারীত্বে'র সাধারণ ধারণা নিয়ে আলাপ করেছি। দেখিয়েছি এর অভ্যন্তরীণ বাহ্যিক, দৃশ্যমান অদৃশ্যমান দিক গুলো..”
এবার আসুন তত্ত্ব ছেড়ে জীবনে। নারীত্ব, পুরুষত্বকে কী দিতে সক্ষম? স্ত্রীর কাছে স্বামী সবচেয়ে বেশি কোন বিষয়টির আশা ও প্রয়োজনবোধ করেন?
আমি মনে করি একজন মুসলিম স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এই পাঁচটি কাজ করতে পারেন।

১. বিশ্বস্ততা রক্ষা

স্ত্রীর বিশ্বস্ততা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা স্বামীর সবচেয়ে অমূল্য প্রাপ্তি। আস্থা যে বিয়ের ভিত্তি, সেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাদের জীবনসাথির ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করেন। যেসব জিনিস না থাকলে সম্পর্ক টেকে না, সেগুলোর প্রথমটিই হলো বিশ্বাস। ড. জন গটম্যানের মতো রিলেশনশিপ এক্সপার্টরা তাদের গবেষণায় এ বিষয়টি দেখিয়েছেন।
স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই যেন অনুভব করতে পারেন যে, তারা একে অপরের প্রতি নিষ্ঠাবান। অর্থাৎ তারা সঙ্গীর কাছে প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, পরকীয়া বা অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে নিরাপদ।
সুতরাং নিশ্চিত করুন যে, আপনি শুধু তারই। তার গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। বান্ধবীদের কাছে তার নামে বদনাম করবেন না। অন্যের সামনে তাকে হেয় করবেন না। অন্য পুরুষের কথা ভাববেন না। তার অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষের সামনে নিজেকে দেখিয়ে বেড়াবেন না।
সূরা আন-নিসার এই আয়াতে আল্লাহ আমাদের বলেছেন যে, একজন ধার্মিক স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি উভয় ক্ষেত্রেই তার অনুগত।
"সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগত এবং বিনম্র। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তারা তার অধিকার ও গোপন বিষয় রক্ষা করে। আল্লাহই গোপনীয় বিষয় গোপন রাখেন।

২. নিজেকে সুন্দরভাবে সাজান

আমরা সবাই এই কথাটা শুনেছি, "men are visual creatures."
আসলেই কিন্তু।
তাই স্ত্রীগণ, ঘরে আপনার সৌন্দর্যের দিকে একটু খেয়াল করুন। চাপ নিতে বলছি না। হয়তো তিনটি ছোট বাচ্চা আপনাকে টানাহ্যাঁচড়া করছে, কানের কাছে চিৎকার করছে, আপনার চোখেমুখে হাঁচি দিচ্ছে। এমন অবস্থায় আপনাকে প্রতিদিন হাইহিল পরে হাঁটতে হবে বা সুন্দর পোশাক পরতে হবে, এমন না। কিন্তু মাঝেমধ্যে সুযোগ পেলে তো তা করাই যায়।

স্বামীর কাছে সুন্দর দেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী দায়িত্ব। এটি মোটেও লজ্জাজনক বা অমার্জিত কাজ নয়। কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত তো নয়ই। এক বোন আমাকে একবার বলেছিল যে, সে নাকি এ রকমটাই বিশ্বাস করে। অথচ হাদীসে কী বলা হয়েছে দেখুন:

আয়মান বলেন, "একদিন আয়িশার কাছে গেলাম। তাঁর পরনে ছিল পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা কাপড়ের একটি কামিজ। তিনি আমাকে বললেন, 'আমার এই দাসীও ঘরের ভেতরে এটা পরতে চায় না। অথচ রাসূলুল্লাহ এটি এর জীবদ্দশায় সারা মদীনায় আমারই শুধু এ রকম একটি কামিজ ছিল। মদীনায় কোনো মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজাতে গেলেই আমার কাছে কাউকে পাঠিয়ে চেয়ে নিত এই কামিজটি।"(১৯১

এ ছাড়াও আমাদের মা আয়িশা টু-এর অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায়,

আয়িশাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "কোন ধরনের নারী সবচেয়ে উত্তম?" তিনি বলেছিলেন, "যে খারাপ কথা বলতে জানে না এবং পুরুষদের মতো ধূর্ত নয়। তার মনোযোগ কেবল স্বামীর জন্য নিজেকে সাজিয়ে তোলা এবং পরিবারের যত্ন নেয়ায়।"

৩. স্বামীর আনুগত্য করা এবং তার কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া

আধুনিকমনাদের কানে কথাটা শ্রুতিকটু লাগে। কারণ, 'আনুগত্য' শব্দটাকেই নেতিবাচকভাবে দেখে বেশির ভাগ আধুনিক মানুষ। চোখে ভেসে ওঠে সামন্ততন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্র, ভূমিদাসত্ব সবকিছু। আমরা নিজেকে 'মুক্তচিন্তার অধিকারী', 'স্বাধীন' ইত্যাদি ভাবতে ভালোবাসি।

তবে বাস্তবতা হলো, আমরা সবাই কিছু-না-কিছু বা কারও-না-কারও আনুগত্য করি। জেনে হোক বা না জেনে। নিকৃষ্টতম আনুগত্য হলো শয়তান এবং নিজের নাফসের আনুগত্য। আনুগত্যের সর্বাধিক হকদার এক আল্লাহ। মুসলিম স্ত্রীর জন্য এর পরপরই আসে হালাল বিষয়ে স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারটি। যতক্ষণ সে একজন ধার্মিক এবং তাকওয়াবান ব্যক্তির সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ, ততক্ষণ মুসলিম স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য করবে।

আবু হুরায়রা এ বর্ণনা করেছেন যে,-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "কেমন স্ত্রী শ্রেষ্ঠ?"

তিনি বলেছিলেন, "যার দিকে তাকালেই মন ভরিয়ে দেয়, কথা শোনে এবং নিজের ও তার ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় না।

স্বামীকে বুঝতে দিন যে আপনি তাকে সম্মান করেন। তাকে ভালোবাসেন। ছোট ছোট এমন কাজ করুন, যা আপনি জানেন তাকে সন্তুষ্ট করবে।

আপনার স্বামীর প্রেমের ভাষা কী?

মতে, ভালোবাসা প্রকাশ করা ও ভালোবাসা পাওয়াব পাঁচটি উপায়কে 'প্রেমের ভাষা' ত. গ্যারি ্যাপম্যানের 'দ্য ফাইভ লাভ ল্যাঙ্গুয়েজস' নামে একটি বই আছে। চ্যাপম্যানের বলা হয়। সেগুলো হলো:

স্বীকৃতি,সময় কাটানো,উপহার প্রাপ্তি,সেবাযত্ন,শারীরিক স্পর্শ।

আপনার স্বামীর পছন্দের প্রেমের ভাষাগুলো শিখে নিন। এটি প্রদর্শন করুন আপনার যত্নের মাধ্যমে। হঠাৎ একদিন কোনো উপহার দিয়ে চমকে দিন বা তার প্রশংসা করুন। তার ভালো কাজের স্বীকৃতি দিন। কিছু সময় নির্ধারণ করুন একান্তই আপনাদের দুজনার।

৪. শারীরিক ঘনিষ্ঠতা

ইসলামে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নারী-পুরুষ সকল মুমিনের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা। বিশেষ করে বর্তমানে আমাদের পর্ন-আসক্ত, নগ্নতায় ভরপুর আধুনিক সমাজে এর গুরুত্ব অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

ব্যভিচারের মতো মারাত্মক পাপের হাত থেকে রক্ষা ছাড়াও বৈবাহিক ঘনিষ্ঠতা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বন্ধনকে জোরদার করে। অনেক লেখালেখি হয়েছে এ বিষয়ে। শারীরিক ঘনিষ্ঠতা অক্সিটোসিন বা তথাকথিত "লাভ হরমোন" তৈরি করে। আরও উৎপাদন করে অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান, যা সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করে, বাড়ায় সুখশান্তি।

"... যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে নারীদের নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করতে। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, সেই সত্তার কসম!

কোনো নারী আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য ততক্ষণ সম্পাদন করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে। তার স্বামী যদি তাকে একান্ত সময়ের জন্য ডাকে তবে তার সেটা অস্বীকার করা উচিত নয়। এমনকি উটের পিঠে থাকলেও না। সদ্য

এই হাদীসটি দুটি বিষয়ে জোর দেয়। স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং স্বামীর প্রতি সম্মান ও আনুগত্য।

৫. ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।

সংসার সামলানোর জন্য নারীদের ঘরে থাকার ধারণাটি আধুনিক নারীবাদী সমাজে প্রীতিমতো গর্হিত। নিজেকে স্বাবলম্বী, স্বাধীন মনে করা নারীরা এর কথা শুনলেই বলেন, "গৃহিণী?? অসম্ভব!!"

আমি এসব জানি, কারণ আমিও তাদের মতোই ভাবতাম একসময়। তবে আমি আলহামদুলিল্লাহ সেই মানসিকতা ছেড়ে এসেছি। অবতীর্ণ হয়েছি স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকায়। ঘরের দুর্গটি সামলাচ্ছি খুব গুরুত্ব সহকারে।

সমাজ আমাদের ব্রেইন ওয়াশ করে যে, ঘর সামলানো মানে নিতান্ত নিষ্কর্মা থাকা। কাপড় ধোয়া, বাসন ধোয়া, খাবার বান্না করা, মেঝে পরিষ্কার করা, টয়লেট পরিষ্কার করা এবং সদাইপাতি কিনে আনার মতো কাজগুলোকে দেখা হয় অর্থহীন শ্রম বা সাংসারিক গোলামি হিসেবে। উচ্চশিক্ষিত নারীর জন্য উপযুক্ত মনে করা হয় না এগুলো।

"সে কি দাসী নাকি, অ্যাঁ?"

না, তিনি স্ত্রী। এটি একটি ফুলটাইম জব। স্ত্রী হওয়া মানে একটি পরিবারের জন্য সহজ জীবন নিশ্চিত করা। সে উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন ছোটবড় নানা কাজ পরিচালনা করা। আপনার স্বামী

পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে কাজ করছেন (যা তার ইসলামী দায়িত্ব এবং স্ত্রী হিসাবে আপনার অধিকার)। আর এদিকে আপনি তৈরি করছেন একটি শান্ত, সুসংগঠিত গৃহ।

____________★★★__________

রেফারেন্স

১.**নারীবাদের আর্তনাদ।**

২.আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে **মুসলিম নারী সমাজ।**

৩.কথিত নারীবাদীদের ইতিহাস,বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচার **ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা।**

৪.**নারীবাদ দার্শনিক ভিত্তি।**

৫.**বিহাইন্ড ফেমিনিজম** নারীবাদের বাস্তবতা।

৬.**সংসার ভাবনা।**

৭.Google